بنغالي
BENGALI

বিদআত থেকে সাবধান

البدعة

تعريفها، أنواعها، أحكامها

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالجبيل
JUBAIL DA'WAH & GUIDANCE CENTER
هاتف: ٣٦٢٥٥٠٠ ٠٣ فاكس: ٣٦٢٦٦٠٠ ٠٣ ص.ب. ١٥٨٠ الرمز البريدي: ٣١٩٥١
الموقع الرسمي: jubaildawah.org البريد الإلكتروني: info@jubaildawah.org

বিদআত থেকে সাবধান

মূলঃ শায়খ সালেহ ফাওযান আল-ফাওযান

অনুবাদঃ আব্দুলাহ্‌ বিন শাহেদ

লিসান্সঃ মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

البدعة- تعريفها- أنواعها- أحكامها

تاليف:

فضيلة الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان

الترجمة: عبد الله بن شاهد

জুবাইল দা'ওয়া এন্ড গাইডেন্স সেন্টার, সউদী আরব

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالجبيل

www.alislaah.com

সূচীপত্র الفهارس

বিষয়ঃ	পৃষ্ঠা	الموضوع
অনুবাদকের আরজ	5	كلمة المترجم
ভূমিকা	6	المقدمة
বিদআতের সংজ্ঞা ও প্রকার	7	تعريف البدعة و أقسامها
দ্বীনের মধ্যে বিদআতের প্রকার	8	أقسام البدعة فى الدين
দ্বীনের মধ্যে বিদআতের হুকুম	10	حكم البدعة فى الدين
একটি সতর্কতা	12	تنبيه هام
মুসলিম সমাজে বিদআতের অনুপ্রবেশ	16	ظهور البدع فى حياة المسلم
বিদআত প্রকাশের অঞ্চলসমূহ	18	مكان ظهور البدع
বিদআত প্রকাশের কারণসমূহ	19	أسباب ظهور البدع
বিদআতীর ব্যাপারে আলেমদের অবস্থান	27	موقف الأمة من المبتدع
বিদআতীর প্রতিবাদে আলেমদের পদ্ধতি	31	منهج الرد على أهل البدع
প্রচলিত কতিপয় বিদআতের উদাহরণ	34	نماذج من البدع المعاصرة
মীলাদ মাহফিল উদ্‌যাপন	35	الاحتفال بالمولد
অলীর কাছ থেকে বরকত গ্রহণ	48	التبرك بالأماكن والأشخاص
ইবাদতের ক্ষেত্রে বিদআত সমূহ	51	البدعة فى مجال العبادات
নামাযের শুরুতে মুখে নিয়ত উচ্চারণ	52	التلفظ بالنية فى الصلاة
ফরজ নামাযের পর দলবদ্ধভাবে জিকির	53	الذكر الجماعى بعد الصلاة
ধর্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করা	56	الاحتفال بالمناسبات الدينية

রজব মাসে বিভিন্ন বিদআত	**56**	البدعة الرجبية
সূফীদের বানোয়াট ওযীফা	**57**	الأذكار الصوفية
শবে বরাতের বিদআত	**57**	البدع في شعبان
কবরের সাথে সম্পৃক্ত বিদআতসমূহ	**65**	البدع المتعلقة بالقبور
পরিশিষ্ট	**71**	الخاتمة

অনুবাদকের আরজ

সৌদি আরবে আল-জুবাইল ইসলামিক সেন্টারে চাকরীরত অবস্থায় শাইখ সালেহ ফাওজান কর্তৃক রচিত (البدعة) "বিদআত" নামক বইটি হাতে পাই। বইটিতে বিদআতের পরিচয়, প্রকারভেদ, এবং হুকুমসহ সমকালীন মুসলিম সমাজে প্রচলিত বিদআতের বেশ কিছু উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। বইটি হাতে নিয়ে প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত একনজর দেখেই বাংলাভাষী ভাইদের জন্য অনুবাদ করার ইচ্ছা পোষণ করি। অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনুবাদের কাজও সমাপ্ত হয়ে যায়।

মানুষ যেহেতু ভুলের উর্ধে নয়, সেহেতু বইটিতে ভুল থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। ধরিয়ে দিলে কৃতজ্ঞ হব এবং পরবর্তীতে সংশোধন করার চেষ্টা করব। বইটি পড়ে পাঠক সমাজ উপকৃত হলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। বইটির অনুবাদ ও অন্যান্য বিষয়ে যারা বিভিন্নভাবে আমাকে সহায়তা করেছেন, তাদের সকলকে আল্লাহ জাযায়ে খায়ের দান করুন।

আমীন॥

ভুমিকা

বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা। যিনি আমাদেরকে তাঁর আনুগত্য করার আদেশ দিয়েছেন এবং সকল প্রকার বিদআত থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আনুগত্য ও আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করার জন্য প্রেরিত আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর পরিবার, সাথী এবং সকল অনুসারীদের উপর।

এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাটি বিদআতের প্রকারভেদ ও সেসবের প্রতি নিষেধের ব্যাপারে আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল (সাঃ), মুসলমানদের ইমাম এবং সর্বসাধারণের জন্য নসীহতের দাবী স্বরূপ লিখিত হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদঃ

বিদআতের সংজ্ঞাঃ

বিদআত শব্দটি আরবী (البدع) শব্দ থেকে গৃহীত হয়েছে। এর অর্থ হল পূর্বের কোন দৃষ্টান্ত ও নমুনা ছাড়াই কোন কিছু সৃষ্টি ও উদ্ভাবন করা। যেমন আল্লাহ বলেছেন,

﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

অর্থঃ পূর্বের কোন নমুনা ব্যতীত আল্লাহ তায়া'লা আকাশ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। (সূরা বাক্বারাঃ ১১৭) তিনি আরো বলেন,

﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنْ الرُّسُلِ﴾

অর্থঃ হে নবী! আপনি বলে দিন, আমি প্রথম রাসূল নই। (সূরা আহ্ক্বাফঃ ৯) অর্থাৎ মানুষের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে আমিই প্রথম রেসালাতের দায়িত্ব নিয়ে আসিনি বরং আমার পূর্বে আরো অনেক রাসূল আগমণ করেছেন।

ইসলামের পরিভাষায় বিদআত বলা হয় দ্বীনের মধ্যে এমন বিষয় তৈরী করা, যা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদার যুগে ছিলনা বরং পরবর্তীতে উদ্ভাবন করা হয়েছে।

বিদআতের প্রকারভেদঃ

বিদআত প্রথমতঃ দু'প্রকারঃ- (১) পার্থিব বিষয়ে বিদআত এবং (২) দ্বীনের ক্ষেত্রে বিদআত। পার্থিব বিষয়ে বিদআতের অপর নাম নতুন আবিষ্কৃত বিষয়। এ প্রকার বিদআত বৈধ। কেননা দুনিয়ার

সাথে সম্পর্কশীল সকল বিষয়ের ব্যাপারে মূলনীতি হল তা বৈধ। তবে শর্ত হল তাতে শরঈ কোন নিষেধ না থাকা। দ্বীনের ক্ষেত্রে বিদআত তথা নতুন কিছু উদ্ভাবন করা হারাম। কারণ দ্বীনের ব্যাপারে মূলনীতি হল তা অহীর উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ দ্বীনের সমস্ত বিধান কুরআন ও সুন্নাহ থেকে গ্রহণ করতে হবে। রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

﴿مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ ﴾

অর্থঃ যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের মধ্যে নতুন বিষয় তৈরী করবে যা তার অন্তর্ভূক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।[১] তিনি আরও বলেন,

﴿مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ﴾

অর্থঃ যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করবে, যে বিষয়ে আমাদের অনুমোদন নেই, তা আমলকারীর উপর প্রত্যাখ্যাত হবে।[২]

দ্বীনের ব্যাপারে বিদআতের প্রকারভেদঃ

দ্বীনের মধ্যে বিদআত দু'প্রকার। (১) বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিদআত এবং (২) আমলের ক্ষেত্রে বিদআত।

১) বিশ্বাসের ভিতরে বিদআত। যেমন যাহমীয়া, মু'তাযেলা, রাফেযী এবং অন্যান্য সকল বাতিল ফির্কার আকীদা সমূহ।

---

[1] - বুখারী ও মুসলিম।

[2] - সহীহ মুসলিম।

২) আমলের ক্ষেত্রে বিদআত। যেমন আল্লাহ আদেশ দেন নি, এমন বিষয়ের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করা। এটা আবার কয়েক প্রকার হয়ে থাকে। যেমনঃ- (১) নতুন কোন ইবাদত আবিষ্কার করা, (২) শরীয়ত সম্মত ইবাদতের মধ্যে বৃদ্ধি করা, (৩) শরীয়ত সম্মত ইবাদত বিদআতী নিয়মে পালন করা এবং (৪) শরীয়ত সম্মত ইবাদতকে সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট করা, যা শরীয়তে নির্ধারিত নয়।

প্রথম প্রকারঃ

এমন নতুন ইবাদত আবিষ্কার করা, ইসলামী শরীয়তের মাঝে যার কোন ভিত্তি নেই। যেমন নতুন কোন নামায, রোজা এবং ঈদে মীলাদুন্ নবী ও অন্যান্য নামে বিভিন্ন ঈদের প্রচলন করা।

দ্বিতীয় প্রকারঃ

শরীয়ত সম্মত ইবাদতের মধ্যে কিছু বৃদ্ধি করা অথবা হ্রাস করা। যেমন কোন ব্যক্তি আছর কিংবা যোহরের নামায এক রাকাত বাড়িয়ে অথবা কমিয়ে আদায় করল।

তৃতীয় প্রকারঃ

শরীয়ত সম্মত ইবাদাত বিদআতী নিয়মে পালন করা। যেমন হাদীছে বর্ণিত জিকিরের বাক্যগুলি দলবদ্ধভাবে সংগীতাকারে। উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করা। কিংবা ইবাদত পালনে নফসের উপর এমন কষ্ট দেয়া, যা রাসূল (সাঃ)এর সুন্নাতের বিরোধী।

চতুর্থ প্রকারঃ

শরীয়ত সম্মত ইবাদতকে এমন সময়ের সাথে নির্দিষ্ট করে আদায় করা, যা শরীয়ত নির্ধারণ করেনি। যেমন শাবান মাসের ১৫তারিখ দিনের বেলা রোজা রাখা এবং রাতে নির্দিষ্ট নামায আদায় করা। মূলতঃ রোজা ও নামায শরীয়ত সম্মত ইবাদত। কিন্তু ইহাকে নির্দিষ্ট সময়ের সাথে খাছ করার কোন দলীল নেই। রোজা নির্দিষ্ট মাস এবং নামায নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রতিটি ইবাদত তার নির্ধারিত সময়ে আদায় করতে হবে। কিন্তু শাবান মাসের ১৫তারিখে দিনের বেলা রোজা রাখা এবং সারা রাত নফল নামায আদায় করা নিশ্চিতভাবে বিদআত। কারণ এ সম্পর্কে কোন সহীহ দলীল নেই।

দ্বীনের মধ্যে বিদআতের বিধানঃ

দ্বীনের ব্যাপারে সকল প্রকার বিদআতই হারাম ও গোমরাহী। কেননা রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

﴿وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ﴾

অর্থঃ তোমরা দ্বীনের মাঝে নতুন বিষয় আবিষ্কার করা থেকে বিরত থাকবে, কেননা প্রত্যেক নতুন বিষয়ই বিদআত। আর প্রতিটি বিদআতের পরিণাম গোমরাহী বা ভ্রষ্টতা।[1] রাসূল (সাঃ) বলেন,

﴿مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ﴾

---

[1] - আবু দাউদ।

অর্থঃ যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের মধ্যে এমন নতুন বিষয় তৈরী করবে, যা তার অন্তর্গত নয়, তা প্রত্যাখ্যত হবে।[১] তিনি আরও বলেন,

﴿مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ﴾

অর্থঃ যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করবে, যার মধ্যে আমাদের আদেশ নেই, তা আমলকারীর উপর প্রত্যাখ্যাত হবে।[২]

উপরের হাদীছগুলোর মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে, দ্বীনের মধ্যে প্রতিটি নতুন বিষয়ই বিদআত। আর প্রতিটি বিদআতই হারাম ও গোমরাহী। তবে এ হারাম বিদআতের প্রকারভেদ অনুযায়ী বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। বিদআতের কিছু কিছু প্রকার প্রকাশ্য কুফরীরই নামান্তর। যেমন কবরবাসীদের নৈকট্য হানিসলের উদ্দেশ্যে কবরের চতুর্দিকে কাবা ঘরের তাওয়াফের ন্যায় তাওয়াফ করা, কবরের উদ্দেশ্যে পশু যবাই করা, নযর-মান্নত পেশ করা, কবরবাসীর কাছে দু'আ করা, তাদের কাছে আশ্রয় চাওয়া ইত্যাদি। এমন কিছু বিদআতও রয়েছে, যা শির্ক না হলেও মানুষকে শির্কের দিকে নিয়ে যায়। যেমন কবরের উপর গম্বুজ তৈরী করা, কবর উঁচু করা, পাকা করা, কবরের উপর লিখা, কবরের কাছে নামায আদায় করা, দু'আ করা ইত্যাদি। এমন কিছু বিদআতও আছে, যা শির্ক বা তার মাধ্যমও নয়, তবে সঠিক

২- বুখারী ও মুসলিম।

[৩] - সহীহ মুসলিম।

আকিদার পরিপন্থী ও বহির্ভুত। যেমন খারেজী, ক্বাদরীয়াও মুর্জিয়াদের আকিদাহ সমূহ। তাছাড়া এমন কিছু বিদআত রয়েছে, যা গুনাহের অন্তর্ভূক্ত যেমন বৈরাগী হয়ে সংসার ত্যাগ করা, সূর্যের উত্তাপে দাড়িয়ে রোজা পালন করা এবং যৌন উত্তেজনা দমন করার জন্য খাসী হয়ে যাওয়া।

একটি সতর্কতাঃ

আমাদের দেশের কিছু কিছু আলেম বিদআতকে হাসানা এবং সাইয়েআ এদু'ভাগে ভাগ করে থাকে। বিদআতকে এভাবে ভাগ করা সম্পূর্ণ ভুল এবং রাসূল (সাঃ)এর হাদীছের সম্পূর্ণ বিপরীত। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, প্রতিটি বিদআতই গোমরাহী বা ভ্রষ্টতা। আর এই শ্রেণীর আলেমগণ বলে থাকে, প্রত্যেক বিদআত গোমরাহী নয়। বরং এমন কিছু বিদআত রয়েছে, যা হাসানা বা উত্তম বিদআত। হাফেয ইবনে রজব (রঃ) বলেন, "প্রত্যেক বিদআতই গোমরাহী" এটি একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু পরিপূর্ণ বাক্য। এখানে প্রতিটি বিদআতকেই গোমরাহী বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। রাসূল (সাঃ) বিদআতের কোন প্রকারকেই হাসানা বলেন নি। এই হাদীছটি দ্বীনের অন্যতম মূলনীতির অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহর রাসূলের বাণী "যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করল, যা আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।" অতএব যে ব্যক্তি কোন নতুন বিধান রচনা করে দ্বীনের মাঝে প্রবেশ করিয়ে দিবে, তা গোমরাহী বলে বিবেচিত হবে। তা থেকে দ্বীন সম্পূর্ণ মুক্ত।

চাই সে বিষয়টি বিশ্বাসগত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হোক অথবা প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য আমলগত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হোক।

সুতরাং বিদআতে হাসানার পক্ষে মত প্রকাশকারীদের কোন দলীল নেই। কিছু লোক তারাবীর নামাযের ব্যাপারে উমার (রাঃ) এর উক্তি "এটি কতই না উত্তম বিদআত " এ কথাটিকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে থাকে। তারা আরও বলেন, এমন অনেক বিদআত আবিষ্কৃত হয়েছে, যা সালাফে সালেহীনগণ সমর্থন করেছেন। যেমন গ্রন্থাকারে কুরআন একত্রিত করণ, হাদীছ সঙ্কলন করণ ইত্যাদি।

উপরোক্ত যুক্তির উত্তর এই যে, শরীয়তের ভিতরে এ বিষয়গুলোর মূল ভিত্তি রয়েছে। এগুলো নতুন কোন বিষয় নয়। উমার (রাঃ) এর কথা, "এটি একটি উত্তম বিদআত", এর দ্বারা তিনি বিদআতের শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করেছেন। ইসলামের পরিভাষায় যাকে বিদআত বলা হয়, সে অর্থ গ্রহণ করেন নি। মৌলিকভাবে ইসলামী শরীয়তে যে বিষয়ের অস্তিত্ব রয়েছে, তাকে বিদআত বলা হয়নি। এমন বিষয়কে যদি বিদআত বলা হয়, তার অর্থ দাড়ায় জিনিষটি শাব্দিক অর্থে বিদআত, পারিভাষিক অর্থে বিদআত নয়। সুতরাং শরীয়তের পরিভাষায় এমন বিষয়কে বিদআত বলা হয়, যার পক্ষে কোন দলীল-প্রমাণ নেই।

আর গ্রন্থাকারে কুরআন সংকলনের পক্ষে দলীল রয়েছে। নবী (সাঃ) কুরআনের আয়াতসমূহ লিখার আদেশ দিয়েছেন। তবে এই লিখাগুলো একস্থানে একত্রিত অবস্থায় ছিলনা। তা ছিল বিভিন্ন

স্থানে বিচ্ছিন্ন অবস্থায়। সাহাবাগণ তা এক গ্রন্থে একত্রিত করেছেন। যাতে কুরআনের যথাযথ হেফাযত করা সম্ভব হয়।

তারাবীর নামাযের ব্যাপারে সঠিক কথা হলো, রাসূল (সাঃ) তাঁর সাহাবাদেরকে নিয়ে জামাতবদ্বভাবে কয়েকরাত পর্যন্ত তারাবীর নামায আদায় করেছেন। ফরজ হয়ে যাওয়ার ভয়ে পরবর্তীতে ছেড়ে দিয়েছেন। আর সাহাবাগণের প্রত্যেকেই রাসূল (সাঃ) এর জীবিতাবস্থায় ও মৃত্যুর পর একাকী এ নামায আদায় করেছেন। পরবর্তীতে উমার (রাঃ) সবাইকে এক ইমামের পিছনে একত্রিত করেছেন, যেমনিভাবে তাঁরা রাসূল (সাঃ) এর পিছনে তাঁর ইমামতিতে এ নামায আদায় করতেন। তাই ইহা বিদআত নয়।

হাদীছ লিখিতভাবে সংরক্ষণের ব্যাপারেও দলীল রয়েছে। রাসূল (সাঃ) কতিপয় সাহাবীর জন্য তাঁদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হাদীছ লিখে দেয়ার আদেশ দিয়েছেন। বিদায় হজ্জের ভাষণ দেয়ার পর আবু শাহ নামক জনৈক সাহাবী রাসূল (সাঃ) এর কাছে ভাষণটি লিখে দেয়ার আবেদন করলে রাসূল (সাঃ) বলেছেন, (اكتبوا لأبى شاه) অর্থাৎ আবু শাহের জন্য আমার আজকের ভাষণটি লিখে দাও। তবে রাসূল (সাঃ)এর যুগে সুনির্দিষ্ট কারণে ব্যাপকভাবে হাদীছ লিখা নিষেধ ছিল। যাতে করে কুরআনের সাথে হাদীছ মিশ্রিত না হয়ে যায়। পরবর্তীতে যখন রাসূল (সাঃ) ইন্তে কাল করলেন এবং কুরআনের সাথে হাদীছ মিশ্রিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দূরিভুত হলো, তখন মুসলমানগণ হাদীছ সংরক্ষণ করে রাখার জন্য তা লিখার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। যারা এ

মহান কাজে আঞ্জাম দিয়েছেন, তাদেরকে আল্লাহ তায়া'লা উত্তম বিনিময় দান করুন। কারণ তারা আল্লাহর কিতাব এবং নবী (সাঃ)এর সুন্নাতকে বিলুপ্তির আশংকা থেকে হেফাজত করেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ

মুসলিম সমাজে বিদআতের অনুপ্রবেশ ও তার কারণঃ

বিদআতের উৎপত্তিঃ

বিদআতের উৎপত্তির ক্ষেত্রে দু'টি বিষয় লক্ষণীয়।

১) বিদআত প্রকাশের যুগঃ শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রঃ) বলেন, খোলাফায়ে রাশেদার যুগের শেষের দিকে মুসলিম জাতির ঈমান ও ইবাদতের ক্ষেত্রে অধিকাংশ বিদআতের প্রকাশ ঘটেছে। যার সংবাদ রাসূল (সাঃ) আগেই আমাদেরকে প্রদান করেছেন এবং বিদআত থেকে মুসলিম জাতিকে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন,

(عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ)

অর্থঃ আমার পরে তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে, তারা অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। সুতরাং তোমরা সে সময় আমার সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে তোমরা দ্বীনের মাঝে নতুন বিষয় আবিষ্কার করা থেকে বিরত থাকবে, কেননা প্রত্যেক নতুন বিষয়ই বিদআত। আর প্রতিটি বিদআতের পরিণাম গোমরাহী বা ভ্রষ্টতা।[১] বিদআতী ফির্কাসমূহের মধ্যে

[১] - আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুস্ সুন্নাহ, তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ইল্ম। ইমাম তিরমিযী বলেনঃ হাদীছটি হাসান সহীহ। মুসনাদে আহমাদ, (৪/১২৬), মাজমুওয়ায়ে ফাতাওয়া (১০/৩৫৪)।

কাদরীয়া, মুর্জিয়া, শিয়া এবং খারেজী সম্প্রদায়ের বিদআত সর্বপ্রথম হিজরী দ্বিতীয় শতকে প্রকাশ পায়। এসময় সাহাবাদের অনেকেই জীবিত ছিলেন। তাঁরা এসমস্ত বিদআতী মতবাদের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। অতঃপর মু'তাজেলা সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। যার ফলে মুসলমানদের মাঝে অসংখ্য ফিতনা-ফাসাদের সৃষ্টি হয় এবং পরস্পরের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। মুসলিম জাতির বিরাট এক অংশ বিদআতী মতবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। অতঃপর সম্মানিত সাহাবাদের যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর সূফীবাদ নামে আর এক নতুন মতবাদ দেখা দেয়। পর্যায়ক্রমে কবরের উপর গম্বুজ নির্মাণ, কবর পাকা করা ও কবরকে কেন্দ্র করে অসংখ্য বিদআতের প্রকাশ ঘটে। এভাবে সময়ের ব্যবধানে সাথে সাথে বিদআতের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং বিভিন্ন আকার ধারণ করতে থাকে।

বিদআত প্রকাশের অঞ্চল সমূহঃ

বিদআত প্রকাশের দিক দিয়ে ইসলামী অঞ্চলগুলো কয়েক ভাগে বিভক্ত। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ)এর সাহাবাগণ মোট পাঁচটি শহরে বসবাস করতেন। এ সমস্ত দেশ থেকে ঈমানের আলো বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। শহর পাঁচটি হলঃ মক্কা, মদীনা, বসরা, কুফা ও শাম। এ সমস্ত

দেশ থেকে কুরআন, হাদীছ, ফিক্হ ও ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা বিস্তার লাভ করেছিল। পরবর্তীতে মদীনা মুনাওয়ারা ব্যতীত বাকী ৪টি স্থান থেকেই বড় বড় বিদআতগুলির প্রকাশ ঘটেছে। কুফা নগরী থেকে বের হয়েছে শিয়া ও মুর্জিয়াদের বিদআতী কথা ও মতবাদ গুলো। অতঃপর তা অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বসরা শহর থেকে কাদরীয়া, মু'তাজেলাদের বিদআতসহ বিভিন্ন ধরণের ভ্রান্ত ইবাদতের আবির্ভাব হয়ে অন্যান্য দেশে বিস্তার লাভ করে। সিরিয়া থেকে বের হয় আহলে বাইত তথা নবী পরিবারের প্রতি ঘৃণা ও তাঁদের সম্মানে কালীমা লেপন কারীদের বিদআতী কথা-বার্তা। জাহ্মীয়াদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে খোরাসানের সীমান্তবর্তী কোন এক অঞ্চলে। আর এটি হল সর্বনিকৃষ্ট বিদআত। যে দেশ রাসূল (সাঃ)এর মদীনা থেকে যত দূরে অবস্থিত, সেখানকার বিদআতও তত ভয়াবহ ও জঘন্য। উছমান (রাঃ)এর শাহাদাত বরণের পরপরই বের হয়েছে খারেজী সম্প্রদায় ও তাদের বিদআতী মতবাদগুলো। তবে রাসূল (সাঃ) এর শহর মদীনা এ সমস্ত বিদআত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। যদিও কোন কোন লোক মদীনাতে অবস্থান করেও গোপনে কিছু কিছু বিদআতী আকীদা পোষণ করত। কিন্তু তারা অপমানিত অবস্থায় মদীনা বাসীদের সাথে বসবাস করত। মদীনাতে তাদের সামাজিক কোন প্রভাব ও মূল্য ছিলনা। একদল ক্বাদরীয়া মতবাদের লোক মদীনাতে লাঞ্ছিত অবস্থায় বসবাস করত। অপর দিকে কুফায় শীয়া ও মুর্জিয়া, বসরায় মুতাজেলা ও বিদআতী নিয়মে ইবাদতকারীদের

দল এবং সিরিয়ায় নাসীবীয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রকাশ্যে বিদআতের চর্চা করতে থাকে। সহীহ বুখারীতে রাসূল (সাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, আখেরী যামানায় দাজ্জালের ফিতনা মদীনাতে প্রবেশ করতে পারবে না। ইমাম মালেক (রঃ)এর সময়কাল পর্যন্ত মদীনাতে ইলম ও ঈমানের শিক্ষা বর্তমান ছিল। সম্মানিত তিন যুগে মদীনাতে বিদআতের নাম-নিশানা ছিলনা। দ্বীনের মৌলিক বিশ্বাসে আঘাতকারী কোন বিদআতও বের হয়নি। যেমনটি বের হয়েছে অন্যান্য শহর থেকে।

বিদআত প্রকাশের কারণসমূহঃ

কোন সন্দেহ নেই যে, নিঃশর্তভাবে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের অনুসরণই বিদআত ও সকল প্রকার গোমরাহী থেকে বাঁচার একমাত্র উপায়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾

অর্থঃ এটিই আমার সঠিক পথ। সুতরাং তোমরা এই সঠিক পথের অনুসরণ কর। অন্যান্য পথের দিকে গমণ করোনা। তাহলে সে সব পথ তোমাদেরকে আল্লাহর সঠিক পথ হতে বিপদগামী করে দিবে। (সূরা আনআমঃ ১৫৩) আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর বর্ণিত হাদীছে নবী (সাঃ) এআয়াতের অর্থকে অতি সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

﴿خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا خَطًّا ثُمَّ قَالَ هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ هَذِهِ سُبُلٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ ثُمَّ تَلَا (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾

অর্থঃ রাসূল (সাঃ) আমাদের সামনে মাটিতে একটি রেখা টানলেন। সে রেখার উপর হাত রেখে বললেন, এটি হল আল্লাহর পথ। অতঃপর সে রেখার ডানে ও বামে আরো অনেক গুলো রেখা অঙ্কন করে বললেন, এ সবগুলোই পথ। তবে এ সব পথের মাথায় একটি করে শয়তান দাড়িয়ে আছে। সে সদাসর্বদা মানুষকে ঐ পথের দিকে আহবান করছে। একথা বলার পর রাসূল (সাঃ) কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেন,

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِه﴾

অর্থঃ এটিই আমার সঠিক পথ। সুতরাং তোমরা এই সঠিক পথের অনুসরণ কর। অন্যান্য পথের অনুসরণ করনা। তাহলে সে সব পথ তোমাদেরকে আল্লাহর সঠিক পথ হতে বিপদগামী করে দিবে। (সূরা আনআমঃ ১৫৩) সুতরাং যে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাতের পথ থেকে বিমুখ হবে, বিদআতী ও ভ্রান্ত পথগুলো তাকে নিজের দিকে টেনে নিবে।

যে সমস্ত কারণে মুসলিম জাতির ভিতরে বিদআতের উৎপত্তি হয়েছে, সে কারণগুলো সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে আলোচনা করা হলঃ-

১) দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতাঃ

সময় যতই অতিবাহিত হয়েছে এবং মানুষ যখনই নবুওয়াতের সংস্পর্শ থেকে দূরে অবস্থান করেছে, তখনই ইসলাম সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের কমতি দেখা দিয়েছে এবং মানুষ অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে। রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

﴿فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ﴾

অর্থঃ আমার পরে তোমাদের মধ্য থেকে যারা জীবিত থাকবে, তারা অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। সুতরাং তোমরা আমার সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে ধরবে। তোমরা দ্বীনের মাঝে নতুন বিষয় আবিষ্কার করা থেকে বিরত থাকবে, কেননা প্রত্যেক নতুন বিষয়ই বিদআত। আর প্রতিটি বিদআতের পরিণাম গোমরাহী বা ভ্রষ্টতা।[১] তিনি আরো বলেন,

---

1- আবু দাউদ, তিরমিজী।

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا﴾

অর্থঃ আল্লাহ মানুষের অন্তর থেকে দ্বীনি ইলমকে টেনে বের করে নিবেন না। কিন্তু ইলমকে উঠিয়ে নিবেন আলেমদেরকে উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে। শেষ পর্যন্ত যখন কোন আলেম জীবিত থাকবেন না, মানুষেরা তখন মূর্খ লোকদেরকে নিজেদের নেতা নির্বাচন করবে। তাদেরকে দ্বীনের কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বিনা ইলমেই তারা ফতোয়াবাজীতে লিপ্ত হবে। ফলে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হওয়ার সাথে সাথে মানুষদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।[১]

দ্বীনের সঠিক জ্ঞান ও জ্ঞানী লোক ব্যতীত বিদআতের মুকাবেলা করার মত কোন শক্তি নেই। যখন জ্ঞান ও জ্ঞানীগণ উঠে যাবেন, তখন বিদআত ও বিদআতীদের পক্ষে সুযোগ সৃষ্টি হবে।

২) প্রবৃত্তির অনুসরণঃ

এটাই স্বাভাবিক যে, কোন লোক যখন আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের (সাঃ) সুন্নাত থেকে বিমুখ হবে, তখন সে আপন প্রবৃত্তির অনুসরণে লিপ্ত হবে। যেমন আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন,

---

[1] - বুখারী।

﴿فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

অর্থঃ অতঃপর তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জেনে নিন যে, তারা শুধু নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, আল্লাহর হেদায়েতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে আছে? নিশ্চয় আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে সঠিক পথ দেখান না। (সূরা কাসাসঃ ৫০)

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾

অর্থঃ আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন? যে তার খেয়াল-খুশীকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? আল্লাহ জেনে শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার কান ও অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন আর তার চোখের উপর রেখেছেন পর্দা। অতএব, আল্লাহর পর কে তাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবে? অতএব তোমরা কি চিন্তা-ভাবনা করনা? (সূরা আল-জাসিয়াঃ ২৩) সুতরাং আপন খেয়াল-খুশীর অনুসরণ বিদআতের পথকে উম্মুক্ত করে।

৩) আলেমদের অন্ধ অনুসরণঃ

আলেম ও পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ মানুষকে দলীল-প্রমাণের অনুসরণ এবং সত্য জানার আগ্রহ ও তা কবূল করার পথে বিরাট অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছে। আল্লাহ্ তায়া'লা বলেন,

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾

অর্থঃ যখন তাদেরকে বলা হয় আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে থাকে আমরা বরং আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে যে বিষয়ের উপর পেয়েছি, তারই অনুসরণ করব। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই জানতো না এবং সত্য পথপ্রাপ্তও ছিলনা। (সূরা বাক্বারাঃ ১৭০) বর্তমান যুগের কতক মাজহাবপন্থী, সুফী ও কবর পুজারীদের একই অবস্থা। তাদেরকে কিতাব ও সুন্নাতের দিকে ডাকা হলে এবং কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আমলসমূহ বর্জন করতে বলা হলে তারা তাদের মাজহাব, মাশায়েখ এবং বাপ-দাদার দোহাই দিয়ে থাকে।

৪) কাফির-মুশরিকদের সাদৃশ্য করাঃ

বিধর্মী কাফের-মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্য রাখা নতুন নতুন বিদআত সৃষ্টির বিরাট একটি কারণ। আবু ওয়াকেদ আল- লাইছী (রাঃ)এর হাদীছে একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেন, আমরা রাসূল (সাঃ)এর সাথে হুনাইন যুদ্ধের জন্য বের হলাম।

আমরা ছিলাম নতুন মুসলমান। আমরা দেখলাম মুশরিকদের জন্য একটি বড়ই গাছ রয়েছে। তারা সেখান থেকে বরকত লাভের আশায় নিজেদের অস্ত্র ঐ গাছে ঝুলিয়ে রাখে। গাছটির নাম ছিল জাতু আনওয়াত অর্থাৎ বরকতময় বৃক্ষ। আমরা সে গাছটির নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! তাদের জন্য যেমন বরকতময় বৃক্ষ রয়েছে, আমাদের জন্যও একটি বরকতময় বৃক্ষ নির্ধারণ করে দিন। যাতে আমরা যুদ্ধের অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখব এবং বরকত হাসিল করব। রাসূল (সাঃ) তাদের কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, "আল্লাহু আকবার" নিশ্চয় এটি একটি পথ। ঐ সত্বার শপথ, যার হাতে আমার জীবন, তোমরা এমন রীতি-নীতির কথা বললে যেমনটি বলেছিল বনী ইসরাইল সম্প্রদায় আল্লাহর নবী মূসা (আঃ)কে। আল্লাহ্ বলেন,

﴿قَالُوا يَامُوسَى اجْعَل لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾

অর্থঃ তারা বলেছিল, হে মূসা! তাদের জন্য যেমন মা'বূদ রয়েছে, আমাদের জন্যও অনুরূপ একটি মা'বূদ নির্ধারণ করে দিন। মূসা (আঃ) বললেন, নিশ্চয় তোমরা একটি মূর্খ জাতি। (সূরা আরাফঃ ১৩৮) অতঃপর নবী (সাঃ) বললেন, তোমরা তো দেখছি অবশ্যই অতীত জাতিসমূহের পথের অনুসরণ করবে।[১]

এই হাদীছের মাধ্যমে জানতে পারা যায় যে, কাফেরদের সাথে সাদৃশ্য করাই বনী ইসরাঈলদেরকে তাদের নবীর কাছে এরকম

[1] - তিরমিজী।

একটি জঘন্য আবদার করতে উৎসাহিত করেছে। তাদের আবদার ছিল, তাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য একটি মাবূদ নির্ধারণ করে দেয়া হোক, তারা সে মাবূদের এবাদত করবে এবং তা থেকে বরকত হাসিল করবে। বর্তমান কালেও একই অবস্থা। অধিকাংশ মুসলমান বিদআত ও শির্কী কর্মসমূহে কাফের-মুশরেকদের অনুসরণ করে চলেছে। যেমন ঈদে মীলাদুন্ নবী, বিভিন্ন উপলক্ষে দিন ও সপ্তাহ পালন করা, ধর্মীয় বিভিন্ন উপলক্ষে অনুষ্ঠান পালন করা, নেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতিমূর্তি তৈরী করা, স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করা, মাতম করা, মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রকার বিদআতের প্রচলন করা, কবরের উপর গম্বুজ নির্মাণ করা ইত্যাদি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ

বিদআতীদের ব্যাপারে মুসলিম মিল্লাতের আলেমদের অবস্থানঃ

যুগে যুগে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আলেমগণ বিদআতীদের বিদআতী কার্য-কলাপের সামনে কখনই চুপ থাকেন নি। বরং সব সময়ই প্রতিবাদ করতঃ তাদের কর্মকান্ডে বাঁধা দিয়ে এসেছেন। পাঠক সমীপে এ সম্পর্কে কতিপয় দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হলোঃ

১) উম্মে দারদা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আবু দারদা রাগান্বিত অবস্থায় একদা আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি বললাম, ব্যাপার কি? তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! জামাতে নামায আদায় ব্যতীত মুসলমানদের মধ্যে আমি নবী মুহাম্মাদের (সাঃ) সুন্নাতের কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা।

২) আমর বিন ইয়াহয়া হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার পিতাকে আমার দাদা হতে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমরা একবার ফজরের নামাযের পূর্বে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর ঘরের দরজার সামনে বসা ছিলাম। উদ্দেশ্য হল, তিনি যখন বের হবেন, আমরা তার সাথে পায়ে হেঁটে মসজিদের দিকে যাত্রা করব। এমন সময় আমাদের কাছে আবু মূসা আশআরী (রাঃ) আগমণ করে বললেন, আবু আব্দুর রাহমান (ইবনে মাসউদের উপনাম) কি বের হয়েছেন? আমরা বললাম, এখনও বের হন নি। তিনিও আমাদের সাথে বসে গেলেন। তিনি যখন বের হলেন,

আমরা সকলেই তাঁর কাছে গেলাম। আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বললেন, হে আবু আব্দুর রাহমান! আমি মসজিদে এখনই একটি নতুন বিষয় দেখে আসলাম। আলহামদু লিল্লাহ্, এতে খারাপ কিছু দেখিনি। ইবনে মাসউ'দ (রাঃ) বললেন সেটি কি? আবু মুসা (রাঃ) বললেন, আপনার হায়াত দীর্ঘ হলে আপনিও তা দেখতে পাবেন। আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বললেন, আমি দেখলাম, মসজিদে একদল লোক বৃত্তাকারে বসে নামাযের অপেক্ষা করছে। প্রত্যেক দলের মাঝখানে একজন লোক রয়েছে। আর সবার হাতে রয়েছে ছোট ছোট পাথর। মাঝখানের লোকটি বলছে, একশতবার আল্লাহু আকবার পাঠ কর। এতে সবাই একশতবার আল্লাহ্ আকবার পাঠ করে। তারপর বলে, একশতবার আল-হাম্দুলিল্লাহ পাঠ কর। এ কথা শুনে সবাই একশতবার আ-লহাম্দু লিল্লাহ পাঠ করে থাকে। তারপর লোকটি বলে, এবার একশতবার সুবহানাল্লাহ্ পাঠ কর। সবাই একশতবার সুবহানাল্লাহ্ পাঠ করে থাকে। এ কথা শুনে ইবনে মাসউদ (রাঃ) বললেন, তুমি তাদেরকে তাদের পাপের কাজগুলো গণনা করে রাখতে বললে না কেন? আর এটা বললে না কেন যে, তাদের নেকীর কাজগুলো থেকে একটি নেকীও নষ্ট হবে না। কাজেই এগুলো হিসাব করে রাখার কোন দরকার নেই। অতঃপর ইবনে মাসউদ (রাঃ) চলতে থাকলেন। আমরাও তার সাথে চললাম এবং একটি হালাকার (বৈঠকের) কাছে এসে উপস্থিত হলাম। তিনি তাদের কাছে দাড়িয়ে বললেন, একি করছো তোমরা? তারা সকলেই বলল, পাথরের মাধ্যমে গণনা করে আমরা

তাকবীর, তাসবীহ্ ইত্যাদি পাঠ করছি। ইবনে মাসউদ (রাঃ) বললেন, তাহলে তোমরা তোমাদের পাপের কাজগুলোর হিসাব কর। কারণ পাপের কাজগুলো হিসাব করে তা থেকে তাওবা করা দরকার। আমি এ ব্যাপারে জিম্মাদার হলাম যে তোমাদের ভাল কাজগুলোর একটি ভাল কাজও নষ্ট হবে না। এ কথা বলার কারণ এই যে আল্লাহর কাছে কারও আমল বিনষ্ট হয়না। বরং একটি আমলের বিনিময়ে দশটি ছাওয়াব দেয়া হয় এবং দশ থেকে সাত শত গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া হয়।[১] তারপর তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ (সাঃ)এর উম্মাত! অমঙ্গল হোক তোমাদের! কিসে তোমাদেরকে এত তাড়াতাড়ি ধ্বংস করল?!! এখনও নবী মুহাম্মাদের (সাঃ) অসংখ্য সাহাবী জীবিত আছেন। এই তো রাসূল (সাঃ) এর কাপড় এখনও পূরাতন হয়নি। তাঁর ব্যবহারকৃত থালা-বাসনগুলো এখনও ভেঙ্গে যায়নি। ঐ সত্বার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তোমরা যে দ্বীন তৈরী করেছ তা কি মুহাম্মাদের দ্বীন হতে উত্তম? না তোমরা গোমরাহীর দ্বার উম্মুক্ত করেছ? তারা বলল, হে আবু আব্দুর রাহমান! আমরা এর মাধ্যমে কল্যাণ ছাড়া অন্য কোন ইচ্ছা করিনি। তিনি বললেন অনেক কল্যাণকামী আছে, সে তার উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। আল্লাহর নবী (সাঃ) আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, একটি দল কুরআন তেলাওয়াত করবে, কিন্তু কুরআন তাদের গলদেশের

---

[1] - অনুবাদক।

ভিতরে প্রবেশ করবে না। আল্লাহর শপথ করে বলছি, মনে হয় তাদের অধিকাংশই তোমাদের মধ্য থেকে বের হবে। অতঃপর ইবনে মাসউদ (রাঃ) তাদেরকে ছেড়ে চলে আসলেন। আমর ইবনু সালামা (রাঃ) বলেন, আমরা তাদের অধিকাংশকেই দেখলাম, নাহ্‌রাওয়ানের যুদ্ধে খারেজীদের সাথে আমাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছে।[১]

৩) একজন লোক ইমাম মালেক (রঃ)এর নিকট আগমণ করে বলল, আমি কোথা হতে ইহরাম বাঁধব? তিনি বললেন, রাসূল (সাঃ) ইহ্‌রাম বাঁধার জন্য যে সমস্ত স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেখান থেকে ইহরাম বাঁধ। লোকটি বলল, আমি যদি রাসূল (সাঃ) এর নির্ধারিত স্থান থেকে আরো একটু দূর হতে ইহরাম বাঁধি, তাহলে কি বৈধ হবেনা? ইমাম মালেক (রঃ) বললেন, আমি ইহাকে বৈধ মনে করিনা। সে বলল, আপনি ইহার মধ্যে অপছন্দের কি দেখলেন? তিনি বললেন, আমি তোমার উপর ফিত্‌নার ভয় করছি। সে বলল, ভাল কাজ বেশী করে করার ভিতর ফিত্‌নার কি আছে? ইমাম মালেক লোকটির এ কথা শুনে বললেন, আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন,

﴿فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

---

[1] - তিরমিজী।

অর্থঃ অতএব, যারা তাঁর নবীর (সাঃ) আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, ফিতনা (বিপর্যয়) তাদেরকে গ্রাস করবে অথবা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি তাদেরকে আক্রমণ করবে। (সূরা নূরঃ ৬৩) এর চেয়ে বড় মসিবত আর কি হতে পারে যে, তুমি এমন একটি ফজীলতের মাধ্যমে নিজেকে বৈশিষ্টমন্ডিত করতে চাচ্ছ, যার মাধ্যমে স্বয়ং রাসূল (সাঃ) নিজেকে বৈশিষ্টমন্ডিত করেন নি।

বিদআতের প্রতিবাদের ক্ষেত্রে সালাফদের থেকে এমনি আরো অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। এ কয়েকটি উদাহরণই পাঠক সমাজের জন্য পেশ করা হল। আশা করি তাই যথেষ্ট হবে।

বিদআতীদের প্রতিবাদে আলেমগণের পদ্ধতিঃ

বিদআতীদের প্রতিবাদে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আলেমদের পদ্ধতি হলঃ তাঁরা এ ব্যাপারে আল্লাহর কিতাব ও রাসূল (সাঃ)এর সুন্নাতের উপর নির্ভর করে থাকেন। আর এটিই হল সঠিক ও সন্তোষজনক পদ্ধতি। তাঁরা বিদআতীদের কথাগুলো প্রথমে বর্ণনা করেন। তারপর একটি একটি করে সেগুলো খন্ডন করে থাকেন। সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা ওয়াজিব এবং বিদআত থেকে বিরত থাকা জরুরী, এবিষয়ে তারা কুরআন-সুন্নাহ থেকে প্রমাণাদি উপস্থিত করে থাকেন। বিদআতীদের প্রতিবাদে তাঁরা অসংখ্য বই-পুস্তক রচনা করেছেন। ইসলামের মৌলিক বিষয়ের উপর লিখিত তাঁদের কিতাবগুলোতে তাঁরা খারেজী, যাহ্‌মীয়া,

মু'তাজেলা এবং আশায়েরা সম্প্রদায়ের রচিত ঈমান ও আক্বীদা বিষয়ক বিদআতী কথাগুলোর উত্তর দিয়েছেন। এব্যাপারে তাঁরা বিশেষ বিশেষ গ্রন্থও রচনা করেছেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রাঃ) যাহ্মীয়াদের উত্তরে কিতাব লিখেছেন। অন্যান্য ইমামগণও বিভিন্ন ফির্কার লোকদের উত্তরে বিভিন্ন কিতাব রচনা করেছেন। তাদের মধ্যে উছমান বিন সাঈদ দারেমী, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া, তাঁর সুযোগ্য ছাত্র ইবনুল কাইয়িম, শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা কবর পূঁজারী, সূফী মতবাদ ও উপরোক্ত বাতিল ফির্কার লোকদের কঠোর প্রতিবাদ করেছেন।

বিদআতীদের প্রতিবাদে যে সমস্ত কিতাব রচিত হয়েছে, তার সংখ্যা অনেক। নিম্নে উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি কিতাবের নাম উল্লেখ করা হলঃ

পূরাতন লেখনীগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ

(১) ইক্বতেজাউস্ সিরাতিল মুসতাক্বীমঃ কিতাবটি শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রঃ) কতৃক রচিত। কিতাবের বিরাট একটি অংশ জুড়ে তিনি বিদআতীদের প্রতিবাদ করেছেন।

(২) ইনকারুল হাওয়াদেছ ওয়াল বিদাআঃ রচনায় ইবনে ওয়াজ্জাহ

(৩) আল-ইতেসামঃ ইমাম শাতেবী

(৪) আল হাওয়াদেছ ওয়াল বিদআঃ তারতুসী

(৫) আল বা'ঈছু আলা ইনকারিল বিদ্আহ্ ওয়াল হাওয়াদেছঃ আবু শামা

(৬) মিনহাজুস্ সুন্নাহ আন্ নাববীয়াহঃ শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রঃ)। এতে তিনি রাফেজী এবং ক্বাদরীয়া ফির্কার প্রতিবাদ করেছেন।

বর্তমান যুগে বিদআতীদের প্রতিবাদে যেসমস্ত কিতাব রচিত হয়েছে, তার মধ্যেঃ

(১) আল ইবদা'উ ফী মাজার্‌রিল বিদ্আহ্ঃ শায়খ আলী মাহফুয

(২) আস্ সুনানু ওয়াল মুবতাদাআতঃ শায়খ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আশ্-শুকাইরী আল-হাওয়ামেদী।

(৩) আত্-তাহজীরু মিনাল বিদআহ্ঃ শায়খ ইবনে বায (রঃ) একিতাবটি বাংলাভাষায় অনুবাদ হয়েছে।

সর্বযুগের আলেমগণই লেখনী, ভাষণ, জুমআর খুৎবা, প্রচার মাধ্যম, পত্রিকা ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিদআত ও বিদআতীদের প্রতিবাদ করে আসছেন। এসব কর্মতৎপরতা মুসলমানদের সজাগ করণে এবং বিদআতের মূলৎপাটনে যথেষ্ঠ ভূমিকা রেখে চলেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ

সমকালীন বহুল প্রচলিত কতিপয় বিদআতের উদাহরণঃ

সময়ের প্রবাহ, দ্বীনী ইলম্এর স্বল্পতা, বিদআতের দিকে আহবানকারীর সংখ্যাধিক্য, ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ এবং কাফেরদের আচার-আচরণের সাথে সাদৃশ্য করণ, ইত্যাদি কারণে বর্তমানে বিদআতের সয়লাব বয়ে যাচ্ছে। এব্যাপারে রাসূল (সাঃ)এর বাণী বাস্তবায়িত হয়েছে, তিনি বলেছেন,

﴿لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ﴾

অর্থঃ তোমরা অবশ্যই পূর্ববর্তী জাতিসমূহের সুন্নাতের অনুসরণ করবে।[১] সমকালীন বিদআত সমূহের মধ্যে থেকে নিম্মে আমরা কতিপয় বিদআতের আলোচনা করব।

১) নবী (সাঃ) এর জন্ম উপলক্ষে ঈদে মীলাদুন্ নবী পালন করা।

২) কবর, মাযার ও বিভিন্ন স্থান থেকে বরকত লাভ করা।

৩) ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে নতুন নতুন ইবাদত তৈরী করা।

১) রবীউল আওয়াল মাসে নবী (সাঃ) এর জন্ম দিবস উপলক্ষে মীলাদ মাহফিল উদ্‌যাপন করাঃ

---

[1] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ই'তেছাম।

অমুসলিম ইয়াহুদ-নাসারাদের অনুসরণ থেকেই এসেছে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর জন্ম দিবস উপলক্ষে ঈদে মীলাদুন্ নবীর অনুষ্ঠান। অজ্ঞ মুসলমানেরা এবং একদল গোমরাহ্ আলেম প্রতি বছর রাসূল (সাঃ)এর জন্ম উপলক্ষে রবিউল আওয়াল মাসে এই অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। কেউ কেউ মসজিদে এঅনুষ্ঠান করে থাকে। আবার কেউ ঘর বা বিশেষভাবে এর জন্য প্রস্তুতকৃত স্থানে এঅনুষ্ঠান পালন করে থাকে। আর এতে শত শত সাধারণ লোক উপস্থিত হয়। তারা নাছারাদের অন্ধ অনুসরণ করেই এ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে থাকে। এঅনুষ্ঠানে বিদআত ও নাসারাদের সাদৃশ্য থাকার সাথে সাথে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার শির্ক ও অপছন্দনীয় কর্ম-কান্ড। এতে এমন কিছু কবিতা আবৃতি করা হয়, যাতে রাসূল (সাঃ)এর ব্যাপারে এমন বাড়াবাড়ি রয়েছে, যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে দু'আ করা এবং আশ্রয় প্রার্থনা করা পর্যন্ত নিয়ে যায়। অথচ রাসূল (সাঃ) তাঁর প্রশংসার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন,

﴿لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ﴾

অর্থঃ নাসারাগণ যেমন মরিয়মপুত্র ঈসা (আঃ)এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছিল, তোমরা আমার ব্যাপারে সেরূপ বাড়াবাড়ি করোনা। আমি কেবলমাত্র আল্লাহর একজন বান্দা। তোমরা

আমাকে আল্লাহর বান্দা ও রাসূল বল।[১] নাসারারা ঈসা (আঃ)এর মর্যাদা বাড়াতে বাড়াতে আল্লাহর পুত্র হওয়ার আসনে বসিয়েছিল। আবার কেউ কেউ তাঁকে স্বয়ং আল্লাহ হিসাব বিশ্বাস করে তাঁর ইবাদত শুরু করেছে। কেউ বা তাঁকে তিন আল্লাহর এক আল্লাহ্ হিসাবে নির্ধারণ করে নিয়েছে। কিছু কিছ বিদআতী নবী প্রেমিক বিশ্বাস করে যে, রাসূল (সাঃ) তাদের মীলাদ মাহফিলে উপস্থিত হন।

তাছাড়া এসমস্ত মীলাদ মাহফিলে যে সমস্ত পাপ কাজের চর্চা করা হয়, তার মধ্যে রয়েছে দলবদ্ধভাবে গান-বাজনা করা, ঢোল বাজানো এবং সূফীদের বানানো বিদআতী নিয়মে বিভিন্ন জিকির-আজকার করা। কখনও কখনও নারী-পুরুষ একত্রিত হয়ে এসমস্ত কাজে অংশ নিয়ে থাকে। যার কারণে অনেক সময় অশালীন কাজকর্ম সংঘটিত হওয়ার সংবাদও শুনা যায়। এমন কি যদি এসমস্ত অনুষ্ঠান এধরণের অশ্লীল কাজ হতে মুক্ত হয় এবং শুধুমাত্র একত্রিত হয়ে খাওয়া-দাওয়া ও আনন্দ-ফুর্তির মাঝে সীমিত থাকে, তথাপিও তা বৈধ নয়। কারণ তা নব আবিষ্কৃত বিদআত। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "দ্বীনের ব্যাপারে প্রতিটি নতুন বিষয়ই বিদআত। আর প্রতিটি বিদআতই গোমরাহী"। তাছাড়া এতে অন্যান্য অনুষ্ঠানের মত অশ্লীল কাজ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

---

[1] - বুখারী, অধ্যায়ঃ আহাদীছুল আম্বীয়া।

আমরা মীলাদ অনুষ্ঠানকে বিদআত বলি। যদি প্রশ্ন করা হয়, কেন আপনারা বিদআত বলেন? উত্তর হলো, আল্লাহর কিতাব, রাসূল (সাঃ)এর সুন্নাত, সাহাবাদের আমল এবং সম্মানিত তিন যুগের কোন যুগে এর কোন অস্তিত্ব ছিলনা। তাই আমরা এটাকে বিদআত বলি। কারণ যে ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কমনা করা হবে, কুরআন বা সুন্নায় অবশ্যই তার পক্ষে একটি দলীল থাকতে হবে। আর মীলাদ মাহফিলের পক্ষে এরকম কোন দলীল নেই বলেই এটি একটি বিদআতী ইবাদত, যা হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর পর তৈরী করা হয়েছে। মিশরের ফাতেমীয় শিয়া সম্প্রদায়ের শাসকগণ এটাকে সর্বপ্রথম ইসলামের নামে মুসলমানদের মাঝে চালু করে।

বিখ্যাত আলেমে দ্বীন ইমাম আবু হাফস্ তাজুদ্দীন ফাকেহানী (রঃ) বলেন, একদল লোক আমাদের কাছে বার বার প্রশ্ন করেছে যে, কিছু সংখ্যক মানুষ মীলাদ নামে রবীউল আওয়াল মাসে যে অনুষ্ঠান করে থাকে, শরীয়তে কি তার কোন ভিত্তি আছে? প্রশ্নকারীগণ সুস্পষ্ট উত্তর চেয়েছিল। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে উত্তর দিলাম যে, আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতে এর পক্ষে কোন দলীল পাই নি এবং যে সমস্ত আলেমগণ মুসলিম জাতির জন্য দ্বীনের ব্যাপারে আদর্শ স্বরূপ, তাদের কারও পক্ষ থেকে এধরণেরে আমলের প্রমাণ পাওয়া যায় নি। অথচ তারা ছিলেন পূর্ববতী যুগের (সাহাবাদের) সুন্নাতের ধারক ও বাহক।

বরং এই মীলাদ নামের ইবাদতটি একটি জঘণ্য বিদআত, যা দুর্বল ঈমানদার ও পেট পূজারী লোকদের আবিষ্কার মাত্র।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রঃ) বলেন, এমনি আরও বিদআতের উদাহরণ হল, কিছু সংখ্যক মানুষ রাসূল (সাঃ) এর জন্ম দিবসকে ঈদ হিসাবে গ্রহণ করতঃ এউপলক্ষে মীলাদ মাহফিলের আয়োজন করে থাকে। অথচ রাসূলের (সাঃ) সঠিক জন্ম তারিখ সম্পর্কে আলেমগণ যথেষ্ট মতবিরোধ করেছেন। এ ধরণের অনুষ্ঠান পালনকারীদের দু'টি অবস্থার একটি হতে পারে। হয়ত তারা এব্যাপারে ঈসা (আঃ) এর জন্ম দিবস পালনের ক্ষেত্রে নাসারাদের অনুসরণ করে থাকে অথবা নবী (সাঃ) এর প্রতি অতি ভালবাসা ও সম্মান দেখানোর জন্য করে থাকে। যাই হোক এ কাজটি সাহাবাদের কেউ করেন নি। যদি কাজটি ভাল হত, তাহলে অবশ্যই তারা কাজটি করার দিকে আমাদের চেয়ে অনেক অগ্রগামী থাকতেন। তাঁরা রাসূল (সাঃ)কে আমাদের চেয়ে অনেক বেশী ভালবাসতেন এবং সম্মান করতেন। তাঁরা ছিলেন ভাল কাজে আমাদের চেয়ে অনেক বেশী আগ্রহী। তবে তাদের ভালবাসা ও সম্মান ছিল তাঁর অনুসরণ, আনুগত্য, তাঁর আদেশের বাস্তবায়ন এবং প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে তাঁর সুন্নাতকে বাস্তবায়িত করার ভিতরে। তিনি যে দ্বীন নিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন, তার প্রচার ও প্রসারের ভিতরে এবং অন্তর-মন, জবান এবং শক্তি দিয়ে সে পথে জিহাদের মাধ্যমে। এটিই ছিল উম্মতের প্রথম যুগের আনসার ও

মুহাজেরীনে কেরাম এবং উত্তমভাবে তাদের অনুসারী তাবেয়ীগণের পথ।

মীলাদ নামের এবিদআতটির প্রতিবাদে ছোট-বড় অনেক কিতাব রচনা করা হয়েছে। এতে বিদআত ও নাসারাদের সাথে সাদৃশ্য থাকার সাথে সাথে অন্যান্য মীলাদ অনুষ্ঠানের দ্বার উম্মুক্ত করার আশঙ্কা রয়েছে। যেমন মাশায়েখ ও নেতাদের মীলাদ পালন করা, যাতে মন্দ কাজের আরো অনেক দরজা খোলার ভয় রয়েছে। বাস্তবেও তাই হয়েছে। বর্তমানে এমীলাদ মাহফিল শুধুমাত্র রাসূল (সাঃ)এর জন্ম দিবসের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। এখন নেতা-নেত্রী, পীর-ফকীর, শায়েখ-মাশায়েখ এমনকি সাধারণ মানুষের জন্ম দিবসেও মীলাদ মাহফিল উদ্‌যাপন করা হয়ে থাকে।

শাইখ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) বা অন্য কারও জন্মোৎসব পালন করা জায়েয নয়, বরং তা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। কারণ এটি দ্বীনের মাঝে একটি নতুন প্রবর্তিত বিদআত। রাসূল (সাঃ) কখনও একাজ করেন নি। তাঁর নিজের বা তাঁর পূর্ববর্তী কোন নবী বা তাঁর কোন আত্মীয়, কন্যা, স্ত্রী অথবা কোন সাহাবীর জন্মদিন পালনের নির্দেশ দেন নি। খোলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কেরাম অথবা তাবেয়ীদের কেউ একাজ করেন নি। এমন কি পূর্ব যুগের কোন আলেমও এমন কাজ করেন নি। তাঁরা সুন্নাহ সম্পর্কে আমাদের চেয়ে অধিকতর জ্ঞান রাখতেন এবং রাসূল (সাঃ) এবং তার শরীয়ত পালনকে সর্বাধিক

ভালবাসতেন। যদি এ কাজটি ছওয়াবের হত, তাহলে আমাদের আগেই তাঁরা এটি পালন করতেন।

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ দ্বীন। এ দ্বীন পরিপূর্ণ বিধায় আমাদেরকে তার অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং বিদআত থেকে বিরত থাকার আদেশ দেয়া হয়েছে। রাসূল (সাঃ) বলেন, "আমাদের এই দ্বীনের মাঝে যে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।[১] তিনি আরও বলেন, "তোমরা আমার সুন্নাত এবং আমার পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত পালন করবে। আর তা দৃঢ়তার সাথে ধারণ করবে। সাবধান! তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন বিষয় আবিষ্কার করা থেকে বিরত থাকবে। কারণ প্রত্যেক নব প্রবর্তিত বিষয়ই বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা"।[২] এসমস্ত হাদীছে বিদআত প্রবর্তনের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে এবং উম্মতকে এর ভয়াবহতা সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেন,

﴿فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

অর্থঃ অতএব, যারা তাঁর নবীর (সাঃ) আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, ফিত্না (বিপর্যয়) তাদেরকে গ্রাস

---

[1] - বুখারী ও মুসলিম।

[2] - আবু দাউদ।

করবে অথবা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি তাদেরকে আক্রমণ করবে। (সূরা নূরঃ ৬৩) আল্লাহ্ তায়া'লা আরো বলেন,

﴿وَمَاآتاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا﴾

অর্থঃ তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূল (সাঃ) যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর। এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা থেকে তোমরা বিরত থাক। (সূরা হাশরঃ ৭) আল্লাহ্ আরও বলেন,

﴿وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ﴾

অর্থঃ তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহকে বেশী করে স্মরণ করে, পরকালের আশা রাখে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদের জন্য রাসূল (সাঃ)এর জীবনীতে এক সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে। (সূরা আহযাবঃ ২১) আল্লাহ্ বলেন,

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

অর্থঃ আজকের দিনে তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। তোমাদের উপর আমার নেয়ামতকে পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম। (সূরা মায়েদাঃ ৩)

এই আয়াতের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য মনোনীত দ্বীনকে আল্লাহ্ তায়া'লা নবী (সাঃ)এর

ওফাতের পূর্বেই পূর্ণ করে দিয়েছেন। তিনি এই বিষয়টি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন যে, তাঁর ওফাতের পরে লোকেরা কথায় বা কাজে যে সব নতুন প্রথার উদ্ভাবন করে শরীয়তের সাথে যুক্ত করবে, তা বিদআত হিসাবে প্রত্যাখ্যাত হবে। যদিও এগুলোর উদ্দেশ্য ভাল হয়। সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়ীগণ বিদআত থেকে জনগণকে সতর্ক করেছেন ও ভয় প্রদর্শন করেছেন। কেননা এটা ধর্মের ভিতরে অতিরিক্ত সংযোজন, যার অনুমতি আল্লাহ্ তায়া'লা কোন মানুষকে প্রদান করেন নি। ইহা আল্লাহর দুশমন ইয়াহুদী-খ্রীষ্টান কর্তৃক তাদের ধর্মে নব নব প্রথা সংযোজনের সাথে সামঞ্জস্য স্বরূপ। সুতরাং এরূপ করার অর্থ এই যে, ইসলাম অসম্পূর্ণ ছিল। মীলাদপন্থীরা মীলাদের মাধ্যমে তা পূর্ণ করে দিলেন। এটা যে কত বড় অপরাধ এবং আল্লাহর বাণীর বিরোধী, তা সর্বজন বিদিত। আল্লাহ বলেন,

﴿اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ﴾

অর্থঃ আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। (সূরা মায়েদাঃ ৩)

মীলাদ মাহফিল বা নবীর জন্মোৎসব পালন বা এ জাতীয় অন্যান্য উৎসবাদির প্রবর্তনের দ্বারা এ কথাই বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তায়া'লা এই উম্মতের জন্য ধর্মকে পূর্ণতা দান করেন নি এবং রাসূল (সাঃ) তাঁর উপর অর্পিত রেসালাতের দায়িত্ব পালন করেন নি। পরবর্তীতে মীলাদপন্থীরা এসে তাকে পূর্ণ করে দিয়েছেন।

এতে মারাত্মক ভয়ের কারণ রয়েছে এবং এধরণের ইবাদত তৈরী করার মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়া'লা এবং তাঁর রাসূল (সাঃ)এর উপর আপত্তি উত্থাপনের শামিল। অথচ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য ধর্মকে সার্বিকভাবে পূর্ণ করতঃ তাঁর নেয়ামত সম্পূর্ণ করেছেন এবং রাসূল (সাঃ) ইসলামের সুস্পষ্ট বার্তা যথাযথভাবে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তিনি এমন কোন পথ, যা জান্নাতের দিকে নিয়ে যায় এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখে উম্মতকে তা বলে দিতে কোন ত্রুটি করেন নি।

এ কথা সকলের জানা যে, আমাদের নবী সকল নবীদের মধ্যে সর্ব শ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ। তিনি সবার চেয়ে অধিকতর পরিপূর্ণভাবে দ্বীনের পয়গাম ও উপদেশ বার্তা পৌঁছিয়েছেন। যদি মীলাদ মাহফিল আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত দ্বীনের অংশ হত, তাহলে তিনি অবশ্যই উম্মতের কাছে বর্ণনা করতেন বা তাঁর সাহাবীগণ তা করতেন। যেহেতু এমন কিছু পাওয়া যায়না, তাই প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের সাথে এই মীলাদ মাহফিলের কোন সম্পর্ক নেই বরং এটা বিদআত, যা থেকে রাসূল (সাঃ) তাঁর উম্মতকে সাবধান থাকতে বলেছেন।

যদি আমরা এই মীলাদ মাহফিলের বিষয়টি সম্পর্কে কুরআন মাযীদের দিকে ফিরে যাই, তাহলে দেখতে পাই আল্লাহ তায়া'লা তাঁর রাসূল (সাঃ)কে যা আদেশ করেছেন বা যা থেকে নিষেধ করেছেন, তিনি আমাদেরকে তা অনুসরণ করার আদেশ দিয়েছেন এবং জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি এই দ্বীনকে উম্মতের জন্য পূর্ণতা

দান করেছেন। রাসূল (সাঃ) যা নিয়ে এসেছেন তার মধ্যে মীলাদ মাহফিলের কোন ইঙ্গিত পর্যন্ত নেই। এভাবে যদি আমরা সুন্নাতের দিকে লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাই যে, রাসূল (সাঃ) একাজ করেন নি, এর আদেশও দেন নি। এমন কি তাঁর সাহাবীগণও তা করেন নি। তাই আমরা বুঝতে পারি যে, এটা ধর্মীয় কাজ নয় বরং ইয়াহুদী-খ্রীষ্টানদের উৎসব সমূহের অন্ধ অনুকরণ মাত্র। যে ব্যক্তির সামান্যতম বিচক্ষণতা আছে এবং হক গ্রহণে ও তা বুঝার সামান্য আগ্রহ রাখে, তার বুঝতে কোন অসুবিধা হবে না যে, ধর্মের সাথে মীলাদ মাহফিল বা যাবতীয় জন্ম বার্ষিকী পালনের কোন সম্পর্ক নেই। বরং যে বিদআতসমূহ থেকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিষেধ করেছেন, এটি সেগুলোরই অন্তর্ভূক্ত।

বিভিন্ন স্থানে অধিক সংখ্যক লোক এই বিদআতী কাজে লিপ্ত দেখে কোন বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে প্রবঞ্চিত হওয়া সংগত নয়। কেননা সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে সঠিক পথ জানা যায়না। বরং শরীয়তের দলীলের মাধ্যমে তা অনুধাবন করা হয়।

এই মীলাদ মাহফিল সমূহ বিদআত হওয়ার সাথে সাথে অনেক এলাকায় অন্যান্য পাপের কাজ থেকেও মুক্ত নয়। যেমন নারী-পুরুষের মেলা-মেশা, গান-বাজনা ও মাদক দ্রব্যের ব্যবহার ইত্যাদি। সর্বোপরি এসব মাহফিলে শির্কে আকবার তথা বড় ধরণের শির্কও সংঘটিত হয়ে থাকে। আর তা হল রাসূল (সাঃ) ও অন্যান্য আওলীয়ায়ে কেরামের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা, তাদের

কাছে দু'আ করা, সাহায্য ও বিপদ মুক্তির প্রার্থনা করা এবং এই বিশ্বাস পোষণ করা যে তারা গায়েবের খবর জানেন। এই সমস্ত কাজ করলে মানুষ কাফের হয়ে যায়।

অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অনেক লোক এ ধরণের বিদআতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার ক্ষেত্রে খুবই তৎপর ও সচেষ্ট এবং এর পিছনে যুক্তি-প্রমাণ দাঁড় করাতে প্রস্তুত। এধরণের অনুষ্ঠানের পিছনে হাজার হাজার টাকা খরচ করতে তারা দ্বিধাবোধ করে না। অথচ তারা নামাযের জামাতে ও জুমআতে অনুপস্থিত থাকাতে বিন্দুমাত্র কুন্ঠাবোধ করে না। যদিও আল্লাহ তা'আলা এ আমলগুলো পালন করা ওয়াজিব করেছেন। তারা এটাও উপলব্ধি করে না যে, নামাযের মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ছেড়ে দিয়ে তারা চরম অন্যায় করছে। নিঃসন্দেহে এটা দুর্বল ঈমানের পরিচয় এবং পাপাচারের মাধ্যমে অন্তরকে কুলষিত করে নেয়ার পরিচয় বহন করে।

আরো বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, অনেকের ধারণা, রাসূল (সাঃ) মীলাদ মাহফিলে উপস্থিত হন। তাই তারা তাঁকে অভিনন্দন জানাতে দাড়িয়ে যায়। এটা বিরাট মূর্খতা ও অসত্য ছাড়া অন্য কিছু নয়। রাসূল (সাঃ) কিয়ামত দিবসের পূর্বে আপন কবর থেকে বের হবেন না বা কারো সাথে কোন প্রকার যোগাযোগ করবেন না এবং কোন সমাবেশেও উপস্থিত হবেন না। বরং কিয়ামত পর্যন্ত অন্যান্য নবীদের মতই স্বীয় কবরে অবস্থান করবেন এবং তাঁর

পবিত্র রূহ মোবারক প্রভুর নিকট উর্ধাকাশে ইল্লিয়ীনের সম্মানজনক স্থানে সংরক্ষিত থাকবে। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُوْنَ ﴾

অর্থঃ এরপর তোমাদেরকে অবশ্যই মরতে হবে। অতঃপর কিয়ামতের দিনে পুনরায় জীবিত করা হবে। (সূরা মুমেনুনঃ ১৬) রাসূল (সাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমার কবরই সর্বপ্রথম উম্মুক্ত করা হবে। আমিই প্রথম সুপারিশকারী এবং আমার সুপারিশ সবার আগে গৃহীত হবে।

রাসূল (সাঃ)এর উপর দরূদ পাঠ করা ও সালাম পাঠ করা নিঃসন্দেহে একটি ভাল আমল এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের এক উত্তম পন্থা। যেমন আল্লাহ তায়া'আলা বলেছেন,

﴿اِنَّ اللّهَ وَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا﴾

অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দরূদ পাঠান। হে মুমেনগণ! তোমরাও তাঁর উপর দরূদ ও সালাম পাঠাও। (সূরা আহযাবঃ ৫৬) নবী (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠায়, আল্লাহ তার প্রতিদান স্বরূপ তাঁর উপর দশবার রহমত নাযিল করেন।[১]

1 - আহমাদ।

সব সময়ই নবী (সাঃ)এর উপর দরূদ পড়ার বৈধতা রয়েছে। তবে নামাযের শেষে পড়ার জন্য বিশেষভাবে তাকিদ করা হয়েছে বরং নামাযের মধ্যে শেষ তাশাহ্হুদে দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব। অনেক ক্ষেত্রে এই দরূদ পড়া সুন্নাতে মুআক্কাদা। যেমন আযানের পরে, জুমআর দিনে ও রাতে এবং রাসূল (সাঃ)এর নাম উল্লেখ হলে। এব্যাপারে অনেক হাদীছ রয়েছে।

এরূপ বিদআতী অনুষ্ঠান এমন সব মুসলমান দ্বারাও সংঘটিত হচ্ছে , যারা তাদের আক্বীদা ও রাসূল (সাঃ)এর ভালবাসার ব্যাপারে খুবই দৃঢ়তা রাখে। তাকে বলতে হবে, যদি তুমি সুন্নী ও রাসূল (সাঃ)এর অনুসারী হওয়ার দাবী রাখ, তাহলে বল, তিনি স্বয়ং বা তাঁর কোন সাহাবী বা তাঁদের সঠিক অনুসারী কোন তাবেয়ী কি একাজটি করেছেন? না এটা ইয়াহুদী-খ্রীষ্টান বা তাদের মত আল্লাহর অন্যান্য শত্রুদের অন্ধ অনুকরণ? এধরণের মীলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাসূল (সাঃ)এর প্রতি ভালবাসা প্রতিফলিত হয়না। যা করলে ভালবাসা প্রতিফলিত হয়, তা হল তাঁর নির্দেশের অনুসরণ করা, তিনি যা বলেছেন, তা বিশ্বাস করা, যা থেকে নিষেধ করেছেন, তা বর্জন করা। আল্লাহ যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, কেবল সেভাবেই তাঁর উপাসনা করা।

কুরআন ও সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা এবং খোলাফায়ে রাশেদীন ও তাবেয়ীদের প্রদর্শিত পথে চলার ভিতরেই রয়েছে মুসলমানদের জন্য ইহ ও পরকালীন কল্যাণ ও মুক্তি।

২) বিশেষ স্থান এবং জীবিত বা মৃত ওলীর কাছ থেকে বরকত হাসিল করাঃ

কোন বস্তুতে স্থায়ীভাবে কল্যাণ থাকা এবং তা বৃদ্ধি হওয়ার নাম তাবার্‌রুক। কাজেই যে বস্তুতে বরকত নেই এবং যে ব্যক্তি বরকতের ক্ষমতা রাখেনা, তা থেকে বরকত লাভের আশা করা বৈধ নয়। বরকতের সঠিক অর্থ অনুযায়ী একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই সকল বরকতের মালিক। তিনিই বরকত নাযিল করেন এবং তা স্থায়ী করেন। কোন সৃষ্টি জীবের পক্ষে বরকত দান করা অথবা বরকত তৈরী করা সম্ভব নয়। তেমনিভাবে কোন মাখলুকের পক্ষে বরকত স্থায়ীভাবে ধরে রাখা বা আটকিয়ে রাখাও সম্ভব নয়। সুতরাং কোন স্থান, স্মারক চিহ্ন অথবা জীবিত কিংবা মৃত আওলিয়া থেকে বরকত গ্রহণ করা বৈধ নয়। **কেউ যদি এবিশ্বাস করে যে, কোন মাখলুক বরকত দিতে সক্ষম, তাহলে এ ধরণের বিশ্বাস শির্কে পরিণত হবে**। আর যদি বিশ্বাস করে যে, অমুক স্থান যিয়ারত করলে অথবা স্পর্শ করার কারণে আল্লাহর পক্ষ হতে বরকত লাভ হবে, তাহলে তা সরাসরি শির্ক না হলেও শির্কের পথকে উম্মুক্ত করবে এবং পরবর্তীতে শির্কের দিকে নিয়ে যাবে। তবে হাজরে আসওয়াদের কথা ভিন্ন। কারণ হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা মুস্তাহাব। কারণ এ ব্যাপারে নবী (সাঃ) থেকে দলীল রয়েছে। শুধু তাই নয়, নবী (সাঃ) এর যে কোন সুন্নাত পালনের মাধ্যমে বরকত লাভের আশা করা বৈধ।

কোন কোন লোক শায়খ বা পীরদের শরীর, অযুর পানি এবং পাগড়ীসহ অন্যান্য বস্তু থেকে বরকত নেয়ার পক্ষে সাহাবাগণ কর্তৃক রাসূল (সাঃ)এর উচ্ছিষ্ট বস্তু থেকে বরকত গ্রহণ করাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে থাকে। তাদের এ দলীল গ্রহণ সঠিক নয়। কারণ সাহাবাগণ কর্তৃক রাসূল (সাঃ)এর শরীরের লোম, মুখের থুথু এবং শরীরের অন্যান্য অংশ থেকে বরকত গ্রহণ শুধু রাসূল (সাঃ)এর সাথে নির্দিষ্ট ছিল। তাও আবার রাসূল (সাঃ) জীবিত থাকাবস্থায়। মৃত্যুর পর নয়। যদি প্রশ্ন করা হয়, রাসূল (সাঃ)এর সাথে খাছ বা নির্দিষ্ট ছিল, এ কথার দলীল কি? উত্তর হল, রাসূল (সাঃ) এর ওফাতের পর সাহাবাগণ তাঁর ঘর-বাড়ীর আসবাব পত্র এবং কবর শরীফ থেকে বরকত হাসিল করার চেষ্টা করেন নি। রাসূল (সাঃ) যে সমস্ত স্থানে নামায আদায় করতেন এবং যেখানে তিনি বসতেন, সে সকল স্থানেও তারা বরকতের জন্য গমণ করতেন না। অথচ রাসূল (সাঃ)এর ওফাতের পর সাহাবাদের বরকতের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যায় নি। বরং অনেক ক্ষেত্রে আরো বেশী প্রয়োজন ছিল। তা সত্বেও কোন সাহাবী রাসূল (সাঃ)এর রেখে যাওয়া কোন জিনিষ থেকে বরকত লাভ করার চেষ্টা করেন নি। কারণ তারা ভাল করেই জানতেন যে বরকত লাভের ধারাবাহিকতা রাসূল (সাঃ)এর ওফাতের পর শেষ হয়ে গেছে। রাসূলের (সাঃ) জীবিতাবস্থায় তাঁর শরীর থেকে বরকত লাভ করাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে আওলীয়াদের ব্যবহৃত বস্তু থেকে বরকত লাভ করা বৈধ মনে করা আরও

কঠিনভাবে নিষিদ্ধ। কারণ সাহাবাগণ তাঁদের মধ্যকার সৎ লোক যেমন আবু বকর, উমার এবং অন্যান্য সম্মানিত সাহাবাদের কারও নিকট থেকে বরকত লাভ করেন নি। জীবিত সাহাবীদের কাছ থেকেও নয় এবং মৃত্যুবরণকারী সাহাবীদের কাছ থেকেও নয়। তাঁদের কেউ নামায আদায় কিংবা দু'আ করার জন্য গারে হেরা বা হেরা পাহাড়েও যেতেন না, যেখানে রাসূল (সাঃ)এর উপর অহী নাযিল হয়েছিল। তেমনিভাবে তারা নামায পড়া অথবা দু'আ করার জন্য তুর পাহাড়েও যেতেন না, যেখানে মূসা (আঃ)এর সাথে আল্লাহ তায়ালা কথা বলেছেন। যেসমস্ত পাহাড়ের কিছু কিছু স্থানে নবী ও অলীদের অবস্থানের কথা প্রমাণিত আছে, সেসমস্ত স্থানে তাঁরা যেতেন বলেও কোন প্রমাণ নেই। রাসূল (সাঃ) মদীনাতে সবসময় যেস্থানে নামায আদায় করতেন, সাহাবীদের কেউ সেখানে গিয়ে তা স্পর্শ করেছেন বা চুম্বন করেছেন বলে প্রমাণিত নেই। এমনিভাবে মক্কা বা অন্যান্য স্থানের ক্ষেত্রেও অনুরূপ। সুতরাং যে সমস্ত স্থানে রাসূল (সাঃ) সম্মানিত পা দু'টি দিয়ে হেঁটেছেন, যেখানে তিনি নামায আদায় করেছেন উম্মতের জন্য সে সমস্ত স্থান স্পর্শ বা চুম্বন করা যদি বৈধ না হয়, তাহলে অন্য কোন অলীর নামায বা ঘুমানোর স্থানে বরকতের জন্য স্পর্শ করা বা চুম্বন করা কিভাবে বৈধ হতে পারে? মোট কথা মুসলিম উম্মার উলামা সম্প্রদায় এ ব্যাপারে একমত যে, বরকতের জন্য কোন স্থান স্পর্শ বা চুম্বন করা মুহাম্মাদ (সাঃ)এর নিয়ে আসা শরীয়তের কোন অংশ নয়।

৩) ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে বিদআতসমূহঃ

বর্তমানে ইবাদতের ক্ষেত্রে যে সমস্ত বিদআতের আবিষ্কার হয়েছে, তার সংখ্যা অনেক। যার পক্ষে কোন দলীল-প্রমাণ নেই। অথচ আল্লাহর ইবাদতের জন্য মূলনীতি হল, সকল প্রকার ইবাদতের পক্ষে কুরআন বা হাদীছ থেকে দলীল থাকতে হবে। দলীল ছাড়া কোন ইবাদত শরীয়তভুক্ত হওয়ার যোগ্য নয়। যে ইবাদতের পক্ষে কোন দলীল নেই, তা বিদআত হিসাবে পরিগণিত হবে। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি এমন আমল করল, যার পক্ষে আমাদের কোন আদেশ নাই, তা প্রত্যাখ্যাত হবে"।[১] বর্তমানে যে সমস্ত বিদআতের চর্চা করা হয়, তার কতিপয় দৃষ্টান্ত পেশ করা হলঃ

১) নামাযের শুরুতে মুখে নিয়ত পাঠ করাঃ

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযসহ অন্যান্য সকল নামাযের শুরুতে নাওয়াইতু বলে মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা একটি বিদআত। কারণ এটা রাসূল (সাঃ)এর সুন্নাতে নেই। আল্লাহ্ তায়া'লা বলেন,

﴿قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْـأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

অর্থঃ তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে শিক্ষা দিতে চাও? অথচ আল্লাহ্ তায়া'লা আকাশ-যমীনের মধ্যকার সকল বস্তু

---

[1] - মুসলিম।

সম্পর্কে অবগত আছেন। আর আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। (সূরা হুজরাতঃ ১৬) নিয়তের স্থান অন্তর। এটা অন্তরের কাজ, মুখের কাজ নয়। মুখে নিয়ত উচ্চারণের পক্ষে কোন সহীহ তো দূরের কথা, কোন যঈফ হাদীছও পাওয়া যায় না। রাসূল (সাঃ), সাহাবায়ে কেরাম, কোন তাবেঈ বা চার ইমামের কোন ইমাম এভাবে নিয়ত উচ্চারণ করেন নি। এটা কোন এক বুযুর্গ ব্যক্তির তৈরী করা প্রথা। ইসলামের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং তা বর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির জন্য ফরজ। পূর্বেই বলা হয়েছে, নিয়ত শব্দের অর্থঃ ইচ্ছা বা সঙ্কল্প করা। আর তা অন্তরের মাধ্যমে হয়ে থাকে। মুখের মাধ্যমে নয়। সুতরাং কোন কিছু করার জন্য অন্তরে ইচ্ছা বা সঙ্কল্প করলেই সে কাজের নিয়ত হয়ে গেল। তা মুখে বলতে হবেনা।

২) ফরজ নামাযের আগে-পরে দলবদ্ধভাবে জিকির করাঃ

আমর বিন ইয়াহয়া হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার পিতাকে আমার দাদা হতে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমরা একবার ফজরের নামাযের পূর্বে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর ঘরের দরজার সামনে বসা ছিলাম। উদ্দেশ্য হল তিনি যখন বের হবেন, আমরা তার সাথে পায়ে হেঁটে মসজিদের দিকে যাত্রা করব। এমন সময় আমাদের কাছে আবু মূসা আশআরী (রাঃ) আগমণ করে বললেন, আবু আব্দুর রাহমান (ইবনে মাসউদের উপনাম) কি বের হয়েছেন? আমরা বললাম, এখনও বের হন নি।

তিনিও আমাদের সাথে বসে গেলেন। তিনি যখন বের হলেন, আমরা সকলেই তাঁর কাছে গেলাম। আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বললেন, হে আবু আব্দুর রাহআন! আমি মসজিদে এখনই একটি নতুন বিষয় দেখে আসলাম। আল-হাম্‌দু লিল্লাহ্‌, এতে খারাপ কিছু দেখিনি। তিনি বললেন সেটি কি? আবু মুসা (রাঃ) বললেন, আপনার হায়াত দীর্ঘ হলে আপনিও তা দেখতে পাবেন। তিনি বললেন, আমি দেখলাম মসজিদে একদল লোক গোলাকার হয়ে বসে নামাযের অপেক্ষা করছে। সেই দলের মাঝখানে একজন লোক রয়েছে। আর সবার হাতে রয়েছে ছোট ছোট পাথর। মাঝখানের লোকটি বলছে, একশতবার আল্লাহু আকবার পাঠ কর। এতে সকলেই একশতবার আল্লাহু আকবার পাঠ করে। তারপর বলে একশতবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ পাঠ কর। এ কথা শুনে সবাই একশতবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করে থাকে। তারপর লোকটি বলে এবার একশতবার সুবহানাল্লাহ পাঠ কর। সবাই একশতবার সুবহানাল্লাহ পাঠ করে থাকে। একথা শুনে ইবনে মাসউদ (রাঃ) বললেন, তুমি তাদেরকে তাদের পাপের কাজগুলো গণনা করে রাখতে বললে না কেন? আর এটা বললে না কেন যে তাদের নেকীর কাজগুলো থেকে একটি নেকীও নষ্ট হবেনা। কাজেই এগুলো হিসাব করে রাখার কোন দরকার নাই। অতঃপর ইবনে মাসউদ (রাঃ) চলতে থাকলেন। আমরাও তার সাথে চললাম এবং একটি হালাকার (বৈঠকের) কাছে এসে উপস্থিত হলাম। তিনি তাদের কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, একি করছ তোমরা? তারা সবাই

বলল পাথরের মাধ্যমে গণনা করে আমরা তাকবীর, তাসবীহ্ ইত্যাদি পাঠ করছি। ইবনে মাসউদ (রাঃ) বললেন, তাহলে তোমরা তোমাদের পাপের কাজগুলোর হিসাব কর। কারণ পাপের কাজগুলো হিসাব করে তা থেকে তাওবা করা দরকার। আমি এ ব্যাপারে জিম্মাদার হলাম যে, তোমাদের ভাল কাজগুলোর একটি ভাল কাজও নষ্ট হবেনা। এ কথা বলার কারণ এই যে আল্লাহর কাছে কারও আমল বিনষ্ট হয়না। বরং একটি আমলের বিনিময়ে দশটি ছাওয়াব দেয়া হয় এবং দশ থেকে সাত শত গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া হয়। তারপর তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদের উম্মাত! অমঙ্গল হোক তোমাদের! কিসে তোমাদেরকে এত তাড়াতাড়ি ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে?!! এখনও নবী মুহাম্মাদের অসংখ্য সাহাবী জীবিত আছেন। এই তো রাসূল (সাঃ)এর কাপড় এখনও পূরাতন হয়নি। তাঁর ব্যবহারকৃত থালা-বাসন গুলো এখনও ভেঙ্গে যায়নি। ঐ সত্বার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তোমরা যে দ্বীন তৈরী করেছ তা কি মুহাম্মাদের দ্বীন হতে উত্তম? না তোমরা গোমরাহীর দ্বার উম্মুক্ত করেছ? তারা বলল, হে আবু আব্দুর রাহমান! আমরা এর মাধ্যমে কল্যাণ ছাড়া অন্য কোন ইচ্ছা করিনি। তিনি বললেন, অনেক কল্যাণকামী আছে, যে তার উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। আল্লাহর নবী (সাঃ) আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, একটি দল কুরআন তিলাওয়াত করবে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালীর ভিতরে প্রবেশ করবেনা। আল্লাহর শপথ করে বলছি, মনে হয় তাদের অধিকাংশই তোমাদের থেকে বের হবে।

অতঃপর ইবনে মাসউদ (রাঃ) তাদেরকে ছেড়ে চলে আসলেন। আমর ইবনু সালামা (রাঃ) বলেন, আমরা তাদের অধিকাংশকেই দেখলাম নাহ্‌রাওয়ানের যুদ্ধে খারেজীদের সাথে আমাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছে। এখানে কয়েকটি কারণে ইবনু মাসউদ (রাঃ) এ ভালকাজগুলো অপছন্দ করেছেন। প্রথমতঃ তাস্‌বীহ পাঠ করার জন্য গোলাকার হয়ে বসা। দ্বিতীয়তঃ তাসবীহ্ সমূহের সংখ্যা ১০০ নির্ধারণ করা। তৃতীয়তঃ পাথরের মাধ্যমে হিসাব করে এগুলো পাঠ করা। কেননা তাসবীহ্ পাঠের উল্লেখিত পদ্ধতির কোনটিই রাসূল (সাঃ) থেকে প্রমাণিত নয়। জিকিরের ক্ষেত্রে মূলনীতি হল, প্রত্যেক ব্যক্তি হাদীছে বর্ণিত জিকিরগুলো একা একা পাঠ করবে।

৩) মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বিদআতঃ

মৃত ব্যক্তির উপকারের জন্য কুলখানি, চল্লিশা, হাফেজ-আলেমদের দাওয়াত দিয়ে কুরআন খতম, সবীনা খতম পড়িয়ে মৃতের রূহের উপর বখশানো, খতমে ইউনুস, খতমে জালালী, ফাতেহা খানি, ইছালে ছাওয়াব ও অন্যান্য অনুষ্ঠান পালন করা সম্পূর্ণ বিদআত। এগুলোর পক্ষে কোন দলীল নেই। এ সমস্ত অনুষ্ঠানে শরীক হয়ে হাদীয়া ও টাকা-পয়সা গ্রহণ বা প্রদান করা সম্পূর্ণ হারাম।

৪) ধর্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালনঃ

রাসূল (সাঃ)এর মিরাজে গমণ উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান পালন করা এবং রজব মাসের ২৭ তারিখের রাত্রিতে শবে মিরাজের নামে এরাত্রি উয্যাপন করা ও এতে বিভিন্ন ইবাদতে লিপ্ত হওয়া বিদআত। এমনিভাবে হিজরী নব বর্ষ পালন করা এবং এতে শুভেচ্ছা বিনিময় করার ক্ষেত্রে শরীয়তের কোন দলীল নাই।

৫) রজব মাসে বিভিন্ন বিদআতঃ

রজব মাস ফজীলতপূর্ণ মনে করে এমাসে বিভিন্ন ইবাদত করা বিদআত। এমাসে ওমরাহ্ পালন করা। এটাকে রজবী ওমরাহ্ বলা হয়ে থাকে, বেশী করে নফল নামায পড়া এবং নফল রোযা রাখা, সবই বিদআতের অন্তর্ভূক্ত। কেননা অন্যান্য মাসের উপর রজব মাসের আলাদা কোন ফজীলত নেই। এমাসের ওমরাহ্, নামায, রোযা এবং অন্য কোন প্রকার ইবাদতে অন্য মাসের চেয়ে অতিরিক্ত কোন ছাওয়াব পাওয়া যায়না।

৬) সূফীদের বানোয়াট ওযীফাঃ

সূফীদের যত জিকির রয়েছে, সবই বানোয়াট ও বিদআতী জিকির। কেননা এগুলো সবই হাদীছে বর্ণিত শরীয়ত সম্মত জিকিরের পরিপন্থী। তাছাড়া দলবদ্ধ হয়ে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর জিকির, আল্লাহু আল্লাহু বলে জিকির করা, জিকিরে যলী, জিকিরে খফী, জিকিরে রূহী, জিকিরে কলবী ইত্যাদি সবই ইবাদতের নামে নতুন সৃষ্টি তথা বিদআত বা ইসলাম বহির্ভুত কাজ।

৭) শবে বরাতের বিদআতঃ

শাবান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতে কিয়াম করা (নফল নামায পড়া) এবং পরের দিন ছিয়াম পালন করা বিদআত। রাসূল (সাঃ) থেকে এই রাতের নফল নামায এবং দিনের বেলা রোযা রাখার ব্যাপারে কোন সহীহ হাদীছ পাওয়া যায়না। এরাতকে আমাদের দেশের পরিভাষায় শবে বরাত বলা হয়ে থাকে। এরাত সম্পর্কে মানুষের বিদআতী ধারণা এবং এরাতে মানুষ যেসমস্ত বিদআতী আমল করে তার বিস্তারিত বিবরণ প্রয়োজন। নিম্নে তার কিছু বিবরণ পেশ করা হলঃ

শবে বরাতে কুরআন নাযিল হয়েছে বলে ধারণাঃ

শবে বরাত পালনকারীদের বক্তব্য হল, শবে বরাতের রাতেই কুরআন নাযিল হয়েছে। সূরা দুখানের ৩নং আয়াতকে তারা দলীল হিসাবে পেশ করে থাকে। আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾

অর্থঃ আমি কুরআনুল কারীমকে একটি বরকতপূর্ণ রাতে অবতীর্ণ করেছি। এবরকতপূর্ণ রাতই হল শবে বরাতের রাত। কতিপয় আলেম এভাবেই অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন।

তাদের এব্যাখ্যা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। বরং এখানে বরকতপূর্ণ রাত বলতে লাইলাতুল ক্বদর উদ্দেশ্য। আল্লামা ইবনে কাছীর (রঃ) বলেন, অত্র বরকতপূর্ণ রাতই হল লাইলাতুল ক্বদর বা

ক্বদরের রাত। যেমন অন্যত্র সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে। কুরআনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য কথা হল, কুরআনের কোন অস্পষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা যদি অন্য কোন আয়াতে সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়, তাহলে কুরআনের ব্যাখ্যাই গ্রহণ করতে হবে। আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহ সূরা কদরের শুরুতে বলেন,

﴿إِنَّ أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾

অর্থঃ আমি কুরআনকে ক্বদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি। (সূরা কদরঃ ১) আর এ কথা সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত যে, লাইলাতুল ক্বদর রামাযান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে নয়। এমনিভাবে আল্লাহ তায়া'লা রামাযান মাসে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে সূরা বাকারায় বলেন,

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ ﴾

অর্থঃ রামাযান মাস এমন একটি মাস, যাতে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। (সূরা বাকারাঃ ১৮৫) সুতরাং শবে বরাতে কুরআন নাযিল হওয়ার কথা গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা।

শবে বরাতের রাতে আল্লাহ দুনিয়ার আকাশে নেমে আসার ধারণাঃ

শবে বরাতসহ অন্যান্য বিদআতী ইবাদতের পক্ষের আলেমগণ বলে থাকে, এরাতের শেষের দিকে আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং সকল মানুষকে ক্ষমা প্রার্থনার আদেশ দেন।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কল্ব গোত্রের বকরীগুলোর লোম সংখ্যার চেয়ে অধিক সংখ্যক লোকের গুনাহ ক্ষমা করে থাকেন।

উপরোক্ত অর্থ বহনকারী হাদীছটি কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সকল বর্ণনাই যঈফ বা দূর্বল। নির্দিষ্টভাবে এরাতে আল্লাহর দুনিয়ার আকাশে নেমে আসার এবং সকল বান্দাকে ক্ষমা চাওয়ার প্রতি আহবান জানানোর হাদীছটি সুনানে ইবনে মাজায় জাল সনদে বর্ণিত হয়েছে। হাদীছের সনদে ইবনে আবু সাব্রাহ্ নামে একজন জাল হাদীছ বর্ণনাকারী রাবী রয়েছে। তাছাড়া হাদীছটি বুখারী সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত সহীহ হাদীছের বিরোধী। সহীহ হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহ তায়া'লা প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন এবং বলতে থাকেন, কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি ক্ষমা করে দিব। অমুক আছে কি? অমুক আছে কি? এভাবে প্রতি রাতেই ঘোষণা করতে থাকেন। সুতরাং জাল হাদীছের উপর ভিত্তি করতঃ সহীহ হাদীছের মর্ম প্রত্যাখ্যান করে শবে বরাতের রাতে আল্লাহ্ দুনিয়ার আকাশে নেমে আসার আকীদা পোষণ করা এবং সে রাতে বিশেষ ইবাদত করার কোন বৈধতা নেই।

মৃত ব্যক্তির রূহ দুনিয়াতে আগমণের বিশ্বাসঃ

শবে বরাত পালনের পিছনে যুক্তি হল, এরাতে মানুষের মৃত আত্মীয়দের রূহসমূহ দুনিয়াতে আগমণ করে স্ব স্ব আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাৎ করে। এটি একটি অবান্তর ধারণা, যা কুরআন-সুন্নার সুস্পষ্ট বিরোধী। আল্লাহ তায়া'লা বলেন,

﴿وَ مِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُوْنَ﴾

অর্থঃ ওদের (মৃতদের) পিছনে রয়েছে অন্তরায়, তারা সেখানে কিয়ামত দিবস অবদি অবস্থান করবে। (সূরা মুমেনূনঃ ১০০)

এরাত্রে মানুষের ভাগ্য লিখা হয় বলে ধারণাঃ

তাদের এধারণাটিও ঠিক নয়। এ কথার পিছনে কুরআন হাদীছের কোন দলীল নেই। সহীহ হাদীছে রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

﴿كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾

অর্থঃ আকাশ-জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই আল্লাহ তায়া'লা স্বীয় মাখলুকের তাকদীর লিখে রেখেছেন।[১]

হালুওয়া রুটির রহস্যঃ

তাদের বক্তব্য হচ্ছে শবে বরাতের দিন ওহুদ যুদ্ধে নবী (সাঃ) এর দাঁত মোবারক শহীদ হয়েছিল। তাই নবী (সাঃ) শক্ত খাবার খেতে না পারায় নরম খাদ্য হিসাবে হালুওয়া-রুটি খেয়েছিলেন। তাই আমরাও নবীর দাঁত ভাঙ্গার ব্যথায় সমবেদনা প্রকাশ করে হালুওয়া-রুটি খেয়ে থাকি। এটি একটি কাল্পনিক কথা। কারণ ওহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে, শাবান মাসে নয়।

[1] - মুসলিম।

এ রাতে কবর যিয়ারতের পিছনে যুক্তি ও তা খন্ডনঃ

এরাতে রাসূল (সাঃ) বাকী কবরস্থান যিয়ারত করেছেন। তাই আমাদেরকেও এরাতে কবর যিয়ারত করতে হবে। এমর্মে ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ। হাদীছের সনদে হাজ্জাজ ইবনে আরত্বাত নামক একজন যঈফ রাবী রয়েছে। ইমাম বুখারী সহ অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন।

একশত রাকাত নামাযের ভিত্তি খন্ডনঃ

এরাতে একশত রাকাত নামাযের ব্যাপারে যত হাদীছ রয়েছে, তার সবই জাল বা বানোওয়াট। এ নামায সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) থেকে কোন হাদীছ প্রমাণিত নেই। একশত রাকাত নামায পড়ার বিদআতটি ৪৪৮ হিজরীতে সর্বপ্রথম জেরুজালেমের বাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদে প্রবর্তিত হয়। মসজিদের ইমামগণ অন্যান্য নামাযের ন্যায় এ নামাযও চালু করে দেয়।

শবে বরাতের রোযাঃ

শবে বরাতের রোযা রাখার প্রমাণ স্বরূপ দু'টি হাদীছ পেশ করা হয়ে থাকে। প্রথম হাদীছঃ শাবান মাসের মধ্যরাত এলে তোমরা রাতে কিয়াম কর এবং দিনে ছিয়াম পালন কর।[১] এই হাদীছের সনদে ইবনে আবু সাব্‌রাহ নামক একজন জাল হাদীছ রচনাকারী

[1] - ইবনে মাজাহ।

রাবী থাকার কারণে হাদীছটি গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বিতীয় হাদীছঃ ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) বলেন, একবার রাসূল (সাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে বললেন, তুমি কি সিরারে শাবানের রোযা রেখেছ? লোকটি বলল না। অতপর নবী (সাঃ) রামাযানের পরে রোযা দু'টি কাযা আদায় করতে বললেন।[১]

অধিকাংশ আলেমদের মতে সিরার অর্থ মাসের শেষ। উক্ত ব্যক্তি শাবানের শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত রোযা পালনে অভ্যস্ত ছিল অথবা এটা তার মানতের রোযা ছিল। রামাযানের সঙ্গে মিশে যাওয়ার ভয়ে সে রোযা রাখা ছেড়ে দিয়েছিল। কারণ শাবান মাসের শেষের দিকে রামাযানের রোযার সাথে মিশিয়ে রোযা রাখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তাই রাসূল (সাঃ) তাকে রোযা দু'টি কাযা আদায় করতে বলেছিলেন।[২]

প্রিয় পাঠক মন্ডলী! শবে বরাতের পিছনে এত আয়োজন, যার জন্য সরকারী ছুটি পর্যন্ত ঘোষণা করা হয়। লক্ষ লক্ষ টাকা এর পিছনে ব্যয় করা হয়ে থাকে। অথচ এর পিছনে কোন ভিত্তি নেই। মুসলিম জাতির উচিৎ এবিদআত থেকে বিরত থাকা। পরিতাপের বিষয় এই যে, অনেকেই এবিদআতকে বিদআতে হাসানাহ বলে থাকে। আসলে বিদআতে হাসানাহ বলতে কিছু নেই। ইসলামের

---

[1] - মুসলিম।

[2] - মুসলিম।

নামে তৈরীকৃত সকল বিদআতই মন্দ, হাসানাহ বা ভাল বিদআত নামে কোন বিদআতের অস্তিত্ব নেই। রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

﴿كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَ كُلُّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ﴾

অর্থঃ প্রতিটি বিদআতই ভ্রষ্টতা আর সমস্ত ভ্রষ্টতার পরিণাম হল জাহান্নাম।[১] ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, "সমস্ত বিদআতই ভ্রষ্টতা যদিও মানুষ তাকে উত্তম বলে থাকে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, শবে বরাতের এ আয়োজন শুধুমাত্র বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানসহ অনারব দেশসমূহেই দেখা যায়। আরব দেশসমূহে এর তৎপরতা নেই বললেই চলে। বিশেষ করে ইসলামের প্রাণ কেন্দ্র সৌদি আরবে শবে বরাতের কোন অস্তিত্বই দেখা যায়না। মক্কা-মদীনার সম্মানিত ইমামগণের কেউ কোন দিন শবে বরাত উদ্‌যাপন করার প্রতি জনগণকে উৎসাহিত করেন না। কারণ তারা ভাল করেই জানেন যে ইহা দ্বীনের কোন অংশ নয়। বরং তা একটি নব আবিস্কৃত বিদআত। এজন্যই তাঁরা শবে বরাতসহ অন্যান্য সকল বিদআত থেকে মুসলিম জাতিকে সতর্ক করে থাকেন এবং তাদের সকল জুমআর খুৎবা ও অন্যান্য আলোচনা ও ভাষণে বিনা শর্তে কুরআন-সুন্নার অনুসরণের আহবান জানান।

---

[1] - নাসাঈ

কবরের সাথে সম্পৃক্ত বিদআত সমূহঃ

বর্তমানকালে মুসলিম সমাজ যেসমস্ত বিদআতে পরিপূর্ণ তার মাঝে কবরের সাথে সম্পৃক্ত বিদআত সবচেয়ে ভয়াবহ। কবরের উপর গম্বুজ নির্মাণ করা, কবর পাকা করা, কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা, কবর থেকে বরকত হাসিলের জন্য এবং মৃত অলীদের উসীলা দেয়াসহ অন্যান্য শির্কী উদ্দেশ্যে কবর যিয়ারত করা, মহিলাদের কবর যিয়ারত করা এসব কিছুই বিদআত। রাসূল (সাঃ) কবর যিয়ারতকারিনী মহিলা এবং কবরের উপর মসজিদ নির্মাণকারী ও কবরে প্রদীপ প্রজ্জলনকারীদের উপর লানত করেছেন।

রাসূল (সাঃ) শির্কের সকল পথই বন্ধ করে দিয়েছেন এবং শির্ক থেকে উম্মতকে সতর্ক করেছেন। তিনি কবরের ব্যাপারে আরও কঠোরভাবে সাবধান করেছেন এবং আওলীয়া ও সৎ লোকদেরকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। কেননা সৎ লোকদেরকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করাই তাদের ইবাদতের দিকে নিয়ে যায়। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা থেকে সাবধান থাকবে। কেননা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেই অতীত জাতিসমূহ ধ্বংস হয়েছে।[১] তিনি আরও বলেন, খৃষ্টানরা যেমন মরিয়মের পুত্র ঈসা (আঃ) কে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে, তোমরা আমাকে নিয়ে তেমনভাবে বাড়াবাড়ি করনা। আমি আল্লাহর

---

[1] - আহমাদ, তিরমিজী।

একজন বান্দা। সুতরাং তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল বল।[১] তিনি কবরের উপর প্রাচীর নির্মাণ এবং ঘর-গম্বুজ নির্মান করতে নিষেধ করেছেন। আবুল হাইয়াজ আল-আসাদী বলেন, আমাকে আলী (রাঃ) বললেন, আমাকে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) যে কাজ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, আমি কি তোমাকে সে কাজ দিয়ে পাঠাবনা? তা এই যে কোন মূর্তি পেলে তা ভেঙ্গে ফেলবে এবং মাটি থেকে উঁচু কোন কবর পেলে তা ভেঙ্গে মাটির সমান করে দিবে।[২] এমনিভাবে রাসূল (সাঃ) কবরের উপর চুনকাম করতে এবং তার উপর কোন প্রকার নির্মাণ কাজ করতে নিষেধ করেছেন। জাবের (রাঃ) রাসূল (সাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সাঃ) কবরের উপর চুনা লাগাতে, কবরের উপর বসতে এবং তার উপর কিছু নির্মান করতে নিষেধ করেছেন।[৩]

রাসূল (সাঃ) কবরের কাছে নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন। উম্মুল মুমেনীন আয়েশা (রাঃ) বলেন,

﴿لَمَّا نُزِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مِثْلَ مَا صَنَعُوا﴾

---

[1] - বুখারী।

[2] - মুসলিম।

[3] - মুসলিম।

অর্থঃ রাসূল (সাঃ) যখন মৃত্যুকালিন সময়ে উপনীত হলেন, তখন তাঁর মুখমন্ডল একটি চাদর দিয়ে ঢাকা ছিল। তাঁর অবস্থা যখন একটু ভাল হত, তখন মুখের উপর থেকে চাদরটি সরাতেন এবং বলতেন ইয়াহুদ-নাসারাদের উপর আল্লাহর লানত, তারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে। তাদের মত করা থেকে সাবধান করার জন্যই তিনি একথা বলেছেন। তাঁর কবরকে মসজিদে পরিণত করার ভয় না থাকলে মুমেন জননী আয়েশা (রাঃ) এর ঘরে কবর না দিয়ে তাঁকে ঘরের বাইরে কবর দেয়া হত।[১] রাসূল (সাঃ) আরও বলেন,

﴿أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ﴾

অর্থঃ জেনে রাখা উচিৎ যে, তোমাদের পূর্বের লোকেরা তাদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করত। সাবধান! তোমরা কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করোনা। আমি তোমাদেরকে তা থেকে নিষেধ করছি।[২] কবরকে মসজিদে পরিণত করার অর্থ হল কবরের কাছে নামায আদায় করা। যদিও তার উপর মসজিদ নির্মাণ করা হয়নি। মূলতঃ নামাযের জন্য কোন স্থানে গমণ করাই উক্ত স্থানকে মসজিদে রূপান্তরিত করার শামীল।

---

1 - বুখারী, মুসলিম

2 - মুসলিম।

বর্তমান কালে অধিকাংশ মুসলিম সমাজ রাসূল (সাঃ) এর নিষেধ অমান্য করে চলেছে। রাসূল (সাঃ) যা নিষেধ করেছেন, তারা তাতেই লিপ্ত হয়েছে। এতে করে তারা বড় শির্কে লিপ্ত হয়েছে। কবরের উপর নির্মাণ করেছে মসজিদ, গম্বুজ। কবরকে পরিণত করেছে মাযার বা যিয়ারতের স্থানে। লিপ্ত হয়েছে তার কাছে পশু যবেহ করা, কবরবাসীর কাছে দু'আ করা, তাদের কাছে আশ্রয় চাওয়া, তাদের নামে মানতি পেশ করাসহ শির্কের প্রতিটি প্রকারে।

রাসূল (সাঃ) কবরের কাছে বা কবরের দিকে মুখ করে নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন। মুসলমানেরা তাঁর নিষেধ অমান্য করে কবরকে নামাযের স্থানে পরিণত করেছে। তিনি কবরকে মসজিদে পরিণত করতে নিষেধ করেছেন। তারা তাকে মসজিদে পরিণত করেছে। তিনি কবরে প্রদীপ জ্বালাতে নিষেধ করেছেন। তারা তাতে বাতি জ্বালিয়ে হাজার হাজার টাকা অপচয় করছে। রাসূল (সাঃ) মাযারের (কবরের) পাশে ওরশ (উৎসব) করতে নিষেধ করেছেন। এরা কবরের পাশে প্রতি বছর ঈদের মত উৎসব পালন করে চলছে। রাসূল (সাঃ) উঁচু কবরকে মাটির সাথে সমান করে দিতে বলেছেন। সহীহ মুসলিম শরীফে ইমাম মুসলিম আবুল হাইয়াজ আল আসাদী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, আবুল হাইয়াজ আল আসাদী (রাঃ) বলেন,

﴿قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَلَّا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ﴾

অর্থঃ আমাকে আলী (রাঃ) বললেন, রাসূল (সাঃ) আমাকে যে কাজের জন্য পাঠিয়েছিলেন, আমি কি তোমাকে সে কাজের জন্য পাঠাবো না? তা এই যে কোথাও কোন মূর্তি দেখতে পেলে তা ভেঙ্গে ফেলবে। কোন উঁচু কবর পেলে তা মাটির সাথে সমান করে দিবে।[১] সহীহ মুসলিম শরীফে ছুমামা বিন শুফাই (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, আমরা একদা ফুজালা বিন উবাইদের সাথে রোম দেশের বারদুস অঞ্চলে ছিলাম। সেখানে আমাদের একজন সঙ্গী মৃত্যু বরণ করলেন। ফুজালা (রাঃ) তাঁর কবরকে মাটির সাথে সমান করে রাখতে বললেন। কবর পূজারীরা হাদীছের বিরোধীতা করে কবরকে ঘরের মত উঁচু করে থাকে।

প্রিয় পাঠক ভাই! লক্ষ্য করুন! কবরের ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) কি বলেছেন, আর এরা করছে কি। তারা রাসূল (সাঃ)এর সুন্নাতের সম্পূর্ণ বিপরীত পথে চলছে। তাদের বিদআতী কাজ-কর্মের বর্ণনা দিয়ে শেষ করা যাবে না।

প্রিয় পাঠক ! আরো লক্ষ্য করুন! রাসূল (সাঃ) আমাদেরকে কেন কবর যিয়ারত করতে বলেছেন? আমাদেরকে কবর যিয়ারত

---

[1] - মুসলিম।

করতে বলেছেন যাতে কবর আমাদেরকে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং যাতে আমরা কবরের পাশে গিয়ে কবরবাসীর জন্য দু'আ করতে পারি, তার জন্য আল্লাহর রহ্মত ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারি। বর্তমান যুগের নামধারী মুসলমানেরা কবর যিয়ারতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পালটিয়ে দিয়েছে। দ্বীনকে পরিবর্তন করে ফেলেছে। বর্তমানে তাদের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য হল তথায় গিয়ে শির্কে লিপ্ত হওয়া, কবরবাসীর কাছে দু'আ করা, তার উসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করা, কবরবাসীর কাছে প্রয়োজন পূর্ণ করার আবেদন করা, কবর থেকে বরকত তালাশ করা ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট

বিদআত হল কুফরীর প্রাথমিক পর্যায়। তা দ্বীনের মাঝে এমন বিষয় অতিরিক্ত করার নামান্তর, যার অনুমতি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল প্রদান করেন নি। বিদআত যে কোন ক্বীরা গুনাহ থেকে নিকৃষ্ট। শয়তানের কাছে ক্বীরা গুনাহের চেয়ে বিদআত অনেক বেশী প্রিয়। কেননা পাপী লোক পাপ করার সময় ভাল করেই জানে যে, সে পাপের কাজে লিপ্ত হচ্ছে। তাই সে তাওবা করার সুযোগ পায়। কিন্তু বিদআতী বিদআতকে দ্বীন মনে করেই পালন করে থাকে। কাজেই সে তাওবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে। নবী (সাঃ) বলেছেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَهَا﴾

অর্থঃ বিদআত পরিত্যাগ করার পূর্বে আল্লাহ্ তায়া'লা বিদআতীর তাওবা কবূল করেন না। বিদআত সুন্নাতকে ধ্বংস করে ফেলে এবং বিদআতীরা সুন্নাত ও সুন্নীদেরকে ঘৃণা করে।

বিদআত মানুষকে আল্লাহ্ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, আল্লাহর ক্রোধকে আবশ্যক করে এবং অন্তরকে নষ্ট করে দেয়। বিদআতী কিয়ামতের দিনে নবী (সাঃ) এর হাউজে কাউছার থেকে বঞ্চিত হবে। নবী (সাঃ) বলেন,

﴿إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَأَقُولُ إِنَّهُمْ

مِنِّي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي ﴾

অর্থঃ কিয়ামতের দিন আমি তোমাদের জন্যে হাউজে কাউছারের নিকট উপস্থিত থাকব। যে ব্যক্তি আমার কাছে আসবে, আমি তাকে তা থেকে পানি পান করাবো। যে আমার হাউজ থেকে একবার পানি পান করবে, তার আর কখনও পিপাসা হবে না। এমন সময় আমার কাছে একদল লোক আগমণ করবে। আমি তাদেরকে চিনতে পাবো। তারাও আমাকে চিনতে পাবে। অতঃপর আমার ও তাদের মাঝে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হবে। আমি বলব, তারা আমার উম্মত। তখন আমাকে বলা হবে, আপনি জানেন না, তারা আপনার পরে কত বিদআত তৈরী করেছিল। আমি বলব আমার রেখে আসা দ্বীনের মধ্যে যারা পরিবর্তন করেছো, তারা এখান থেকে সড়ে যাও। অতঃপর তাদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করা হবে।[১]

বিদআতীকে নছীহত করা এবং তার বিদআতের প্রতিবাদ করা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে বিদআতীর সাথে চলা-ফেরা করা বৈধ নয়। কেননা এতে বিদআতীর খারাপ আক্বীদা ও আমলগুলো অন্যদের মাঝে প্রবেশ করতে পারে।

---

[1] - বুখারী।

বিদআতীদেরকে শক্তি প্রয়োগ করে ঠেকানো সম্ভব না হলে বিদআতী এবং তাদের অনিষ্টতা হতে মানুষকে সতর্ক করা আবশ্যক। আর শক্তি প্রয়োগ করার সুযোগ থাকলে মুসলিম সমাজের আলেমদের এবং শাসকদের উচিৎ শক্তি প্রয়োগ করে বিদআত প্রতিহত করা ও বিদআতীদেরকে শাস্তি দেয়া। কেননা তারা ইসলামের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। জেনে রাখা উচিৎ যে, কুফরী রাষ্টসমূহ বিদআতীদেরকে তাদের বিদআত প্রচারে উৎসাহ এবং বিভিন্নভাবে সহযোগীতা করে থাকে। তারা এটাকে ইসলাম ধ্বংসের অন্যতম মাধ্যম মনে করে।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তাঁর দ্বীনকে বিজয় দেন এবং তাঁর শত্রুদেরকে অপমানিত করেন। নবী (সাঃ), তাঁর পরিবার এবং তাঁর সাথীদের উপর শান্তির ধারা বর্ষিত হোক।